হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প : বিষয় ও শৈলী

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩ - ২০১৪
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
মে ২০১৮

ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুঠো-ফোন : ০১৭১১৮১৭৬৩

বৈ-ডাক : gias_shamim@yahoo.com

০৬ মে ২০১৮ রবিবার

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, আমার তত্ত্বাবধানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য *হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প: বিষয় ও শৈলী* শীর্ষক গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোনো পরিচ্ছেদ বা এর কোনো অংশ ইতঃপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

(ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন)

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) অবস্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা এই সাহিত্যিকের রচনার পরিমাণ বিপুল। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পধারায় তিনি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৯৭২-২০১২ কালপর্বে তিনি প্রায় শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। নাগরিক মধ্যবিত্তের নানা সংকট ও সম্ভাবনার যথার্থ রূপকার তিনি। জীবন-চিত্রাঙ্কনে তাঁর মধ্যে ছিল না কোনো ভণিতা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছোটগল্পে জীবনের বিচিত্র বিষয়াবলির রূপায়ণ কীভাবে ঘটেছে এবং তিনি কী শিল্পপ্রকরণ অনুসরণ করে জীবনকে রূপায়িত করেছেন তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন থেকে আমরা 'হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প : বিষয় ও শৈলী' শীর্ষক এই এম.ফিল গবেষণা-প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

এম.ফিল গবেষণা-প্রকল্পে যখন ভর্তি হই তখন ছিলাম ঢাকায়। কাজটি তখন সহজ মনে হয়েছিল। কিন্তু জীবিকার তাগিদে ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় আমি বিচিত্র সংকটে নিপতিত হই। ফলে লিখনপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় বারবার। তবু আমার তত্ত্বাবধায়ক, পিতৃপ্রতিম অভিভাবক এবং আমার সর্ববিষয়ের পথনির্দেশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সম্মানিত ও সজ্জন শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (গিয়াস শামীম) স্যারের নিরন্তর উৎসাহ ও নির্দেশনায় শেষাবধি গবেষণা প্রকল্পটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য স্যারের কাছে আমার ঋণ অশেষ।
যেসব সম্মানিত শিক্ষকের মুখচ্ছবি কিংবা স্মৃতি গবেষণার নানা পর্যায়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান সভাপতি আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী, ড. নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা, ড. উপল তালুকদার, ড. মোহাম্মদ আজম প্রমুখ। এ-প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করছি আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক তানিম জসিম, রাফাত আলম মিশু ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মনসুর মুজাহিদ এবং বীরউত্তম শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক অলোক কুমার চক্রবর্ত্তীকে, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চেয়েছেন।

আমার বর্তমান কর্মস্থল শ্রীবরদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হিমাংশু কুমার পাল ও উপাধ্যক্ষ জনাব এ. কে.এম. আলিফ উল্লাহ আহসান স্যার গবেষণাকালে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এজন্য আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কলেজের সহকারি অধ্যাপক মো.মাছুদুজ্জামান ও জনাব কাজী হাসানুজ্জামান স্যারের প্রণোদনাও আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীবরদী সরকারি কলেজে কর্মরত ৩৪-তম বিসিএসের সকল সহকর্মীর প্রতিও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অন্যান্য অগ্রজ ও অনুজ সহকর্মীর প্রতিও রইল শুভেচ্ছা। আমার প্রাক্তন সহকর্মী জনাব আবদুস সবুর; বাল্যবন্ধু সাইফ উদ্দিন রাকিব, গাজী মাহাবুব হাসান, হুমায়ূন-ভক্ত মাহবুবুল আলম হিটু সবাইকে জ্ঞাপন করছি কৃতজ্ঞতা। আমার স্ত্রী ইসমত আরা খাতুন ইরা, দুই পুত্র-আরিয়ান হামিদ বর্ণ ও আদনান হামিদ বর্ষ আমার সকল সৃষ্টিশীল কাজের নিরন্তর উৎস। তাদের প্রতি অফুরান ভালোবাসা।
গবেষণাকালে আমি আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, শ্রীবরদী সরকারি কলেজের লাইব্রেরি এবং অতি নিকটজনদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ কাজে লাগিয়েছি। তাঁদের কাছে আমার অশেষ ঋণ। মুদ্রণ কাজে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বন্ধু হাসানুল হক, বীরউত্তম শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের মো. আকতার হোসেন, শ্রীবরদী সরকারি কলেজের জাহিদ কাউসার ও মো. নূর আলমকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে হুমায়ূন আহমেদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমি আমার এ গবেষণাকর্মটি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করছি।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পধারায় হুমায়ূন আহমেদ অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব (১৯৪৮-২০১২)। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, চলচ্চিত্র, শিশুতোষ সাহিত্য – অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই তাঁর জাদুস্পর্শে হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। উপন্যাস, নাটক কিংবা চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর জনপ্রিয়তা কিংবা সুখ্যাতি তুঙ্গস্পর্শী হলেও একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, ছোটগল্পশিল্পেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় মায়াবী গল্পের মানবিক জাদুকর তিনি। তাঁর ছোটগল্প বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের হালচাল, বিষয়-আশয় তাঁর ছোটগল্পে ভাষারূপে হয়ে উঠেছে বাঙ্ময়।

১৯৭২-২০১২ কালপর্বে হুমায়ূন আহমেদ প্রায় শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। ছোটগল্পের মাধ্যমে অতিদ্রুত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের হৃৎস্পন্দনকে তিনি যতদ্রুত শনাক্ত করতে সক্ষম ছিলেন, তা বাংলাদেশের অন্য কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলত অতিদ্রুত তিনি হয়ে ওঠেন নাগরিক শিক্ষিত যুবাশ্রেণির নানা সংকট ও সম্ভাবনার, আশা ও আকাঙ্ক্ষার, ভালো-লাগা কিংবা ভালোবাসার যথার্থ রূপকার। তাঁর চারপাশের মানুষকে তিনি দেখেছেন সহজ-সরল দৃষ্টিতে, তাঁদের ভেতরকার শুভচেতনা ও সৌন্দর্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অসামান্য কৌতূহলের সঙ্গে। দেশি কিংবা বিদেশি কোনো তত্ত্বের আশ্রয় না নিয়েই তিনি অসামান্য কথামালায় জীবনকে গ্রন্থিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পের সীমিত অবয়বে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে জনপ্রিয়-ধারার এই সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের অসামান্য জনপ্রিয়তায় অনেকেই ঈর্ষাবোধ করেন। তাঁর বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারকে শিল্পের মানদণ্ডে বিচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন অনেকেই। ফলে তাঁর সাহিত্য নিয়ে গবেষণা প্রায় হয়নি বললেই চলে। এমতাবস্থায় হুমায়ূনের ছোটগল্প নিয়ে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে আমি যেন অনেকটা স্রোতের বিপক্ষেই অবস্থান নিয়েছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমি লক্ষ করেছি হুমায়ূনকে কেন্দ্র করে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই স্মৃতিকথাধর্মী; সাহিত্য-মূল্যায়নধর্মী বিশ্লেষণ প্রায় নেই বললেই চলে। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে হুমায়ূনের ছোটগল্পের নির্মোহ মূল্যায়নে পূর্বাপর সচেষ্ট থেকেছি। এই মূল্যায়নে আমি আমার তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে প্রধানত চারটি অধ্যায়ে। এর প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'হুমায়ূন আহমেদের জীবনকথা'। এই অধ্যায়ে স্বল্প পরিসরে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য, বিশেষত তাঁর জন্মপরিচয়, অধ্যয়নকাল, পেশাগত জীবন, সাহিত্যিক জীবন এবং নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে ‘বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের অবস্থান’। এই অধ্যায়ে বিভাগোত্তর কালের বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারা-বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা সাপেক্ষে ছোটগল্প রচনায় হুমায়ূনের স্বাতন্ত্র্য মূল্যায়িত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে ‘হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প’। এটি বর্তমান গবেষণা-প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। এই পরিচ্ছেদে পাঁচটি পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত হয়েছে। পরিচ্ছেদসমূহ হচ্ছে – প্রথম পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত-জীবন; তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নিম্নবিত্ত-জীবন; চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্ক এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের অতিপ্রাকৃত ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক ছোটগল্প।

এই অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় ‘হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের প্রকরণশৈলী’।

চারটি অধ্যায় ছাড়াও অভিসন্দর্ভে সংযোজিত হয়েছে প্রসঙ্গকথা, প্রস্তাবনা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : হুমায়ূন আহমেদের জীবনকথা

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের অবস্থান

তৃতীয় অধ্যায় : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প

- প্রথম পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত-জীবন
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নিম্নবিত্ত-জীবন
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্ক
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের অতিপ্রাকৃত ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক ছোটগল্প

চতুর্থ অধ্যায় : প্রকরণশৈলী

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থাবলি

প্রথম অধ্যায়
হুমায়ূন আহমেদের জীবনকথা

প্রথম অধ্যায়
হুমায়ূন আহমেদের জীবনকথা

১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঞ্জে তাঁর নানার বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর দাদার বাড়ি নেত্রকোণার কুতুবপুরে। বাবার নাম ফয়জুর রহমান আহমেদ। তিনি পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। ১৯৭১ সালের ৫ মে তিনি বরিশালের গোয়ারেখা গ্রাম থেকে বের হলে সন্ধ্যায় খবর আসে বলেশ্বর নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে। তাঁকে প্রথমে পিরোজপুরে এবং পরে হুমায়ূন আহমেদের নন্দন-কানন নুহাশ পল্লিতে সমাহিত করা হয়।

হুমায়ূন আহমেদের বাবা ছিলেন কিছুটা হেঁয়ালি প্রকৃতির। তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর সন্তানদের নাম পরিবর্তন করতেন। হুমায়ূন আহমেদের নাম কয়েকবার পরিবর্তন করে তিনি রাখেন-কাজল, বাচ্চু, শামসুর রহমান।

হুমায়ূন আহমেদের মায়ের নাম আয়শা আক্তার খানম। 'জীবন যে রকম' নামে তিনি একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর লেখক-নাম আয়শা ফয়েজ। তিনি অত্যন্ত সংগ্রামী মানুষ। একজন মহিয়সী নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তানদের পড়ালেখা করিয়েছেন; তাঁদের মানুষ করেছেন। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ বড়। ছোট দুই ভাই– ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং আহসান হাবীব। জাফর ইকবাল সাহিত্যিক এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর; আহসান হাবীব কার্টুনিস্ট এবং 'উন্মাদ' পত্রিকার সম্পাদক।

তিন বোন সুফিয়া হায়দার, মমতাজ সহিদ, রোকসানা আহমেদ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। হুমায়ূন আহমেদের বাবার চাকরিসূত্রে তাঁকে বাংলাদেশের বহু জায়গায় অবস্থান করতে হয়েছে। ফলে স্কুলও পাল্টাতে হয়েছে বারবার। সিলেটের মীরাবাজারে কিশোরীমোহন পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সেরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে বগুড়া জিলা স্কুল ও ঢাকা কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন তিনি। ১৯৬৪ সালে রাজশাহী বোর্ড থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন রসায়ন বিভাগে; থাকতেন মুহসিন হলের ৫৬৪ সংখ্যক কক্ষে। এমএসসিতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। অবশ্য তাঁর প্রথম কর্মস্থল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। প্রভাষক পদে বাকৃবিতে যোগদেন ১৯৭৩ সালে। আমেরিকার নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার রসায়নে ডক্টরেট করে ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আসেন। 'পড়াতে আর ভালো লাগে না' কিংবা পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ' করার মানসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম বিয়ে ১৯৭৩ সালে। স্ত্রীর নাম গুলতেকিন আহমেদ। প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁর নাতনি গুলতেকিন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' পড়ার পর ক্লাস এইটের ছাত্রী গুলতেকিন একটি চিঠি লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রভাষক হুমায়ূন আহমেদকে। এরপর তাঁদের দেখা ও মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠতার পরিণতিতে পরিণয়। হুমায়ূন-গুলতেকিনের দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। বড় ছেলে রাশেদ হুমায়ূন অকালে মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় পুত্র নুহাশ। তিন মেয়ে – নোভা, শীলা আর বিপাশা। ২০০০ সালে হুমায়ূন গুলতেকিনের ডিভোর্স হয়ে যায়।

হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম মেহের আফরোজ শাওন। শাওন হুমায়ূন আহমেদের অনেকগুলো চলচ্চিত্র আর নাটকে অভিনয় করেছেন। সেই সূত্রেই তাঁদের পরিচয়, ভালোবাসা এবং বিয়ে। ২০০৬ সালে তাঁরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। এপক্ষে হুমায়ূন-শাওনের দুই পুত্র – নিষাদ ও নিনিত। ২০১২ সালের ১৯ জুলাই হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা একসাথেই ছিলেন।

হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখির শুরু ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের ছাত্র থাকা অবস্থায় 'ফানুস' নামে একটি কবিতা লিখে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর মহিলা অঙ্গনে পাঠান তাঁর বোন সুফিয়া আহমেদ শেফুর নামে। এটিই ছিল ছাপার হরফে তাঁর প্রথম লেখা। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কবি হননি, হয়েছেন কথাসাহিত্যিক। হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' (১৯৭২)। প্রকাশের দিক থেকে দ্বিতীয় উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' (১৯৭৩)। তাঁর প্রথম উপন্যাসের ভূমিকা লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ। একজন জীবনঘেঁষা ঔপন্যাসিকের আগমন অধ্যাপক শরীফ টের পেয়েছিলেন এবং সেটি পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

১৯৭২ সাল থেকে ২০১২ সাল – এই চল্লিশ বছর সময়পর্বে হুমায়ূন আহমেদ রচনা করেছেন অসংখ্য উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প; নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র এবং টিভি নাটক। তিনি গান লিখেছেন অনেক। ছবিও এঁকেছেন বেশকিছু।

নগরজীবনের পটভূমিতেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস রচিত। তবে গ্রামীণ জীবনের চিত্রও গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন এই কথাশিল্পী। এর উজ্জ্বল উদাহরণ: 'অচিনপুর', 'ফেরা', 'মধ্যাহ্ন'। মুক্তিযুদ্ধ বারবার তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'শ্যামল ছায়া', '১৯৭১', 'আগুনের পরশমণি', 'জোছনা ও জননীর গল্প', 'নির্বাসন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'গৌরীপুর জংশন', 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ', 'চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক' উপন্যাসে জীবন ও তাঁর চারপাশকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বাদশা নামদার', 'মাতাল হাওয়া' ও 'দেয়াল' উপন্যাসের প্লট অতীত ও নিকট অতীতের রাজরাজড়া ও সাধারণ মানুষের গল্প ইতিহাস থেকে সন্নিবেশিত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনি, শিশুতোষ, রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান, আত্মজৈবনিক, কলামসহ তাঁর প্রকাশিত

গ্রন্থের সংখ্যা তিন শতাধিক। গল্প-উপন্যাসের নামকরণে রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-নজরুল সাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি এবং গর্বভরে সে ঋণের কথা স্বীকারও করেছেন। তাঁর সৃষ্টি মিসির আলী, হিমু, শুভ্র পাঠকনন্দিত চরিত্র। মিসির আলী কাজ করেন লজিক নিয়ে আর হিমু কাজ করে এন্টিলজিক নিয়ে। বাংলাদেশে হিমু ও মিসির আলী সিরিজ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

হুমায়ূন আহমেদের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো হলো –'আগুনের পরশমণি' (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক, এ ছবিটি আটটি শাখায় জাতীয় পুরস্কার লাভ করে), 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'শ্যামল ছায়া', 'দুই দুয়ারি', 'চন্দ্রকথা', 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত', 'আমার আছে জল', 'ঘেটুপুত্র কমলা'। তাঁর সব চলচ্চিত্রই দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

টিভি নাটকে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিটিভি'তে প্রচারিত 'এইসব দিনরাত্রি', 'অয়োময়', 'আজ রবিবার' সহ তাঁর অসংখ্য নাটক ছিল নির্মল বিনোদনের উৎস। 'নুহাশ' চলচ্চিত্রের ব্যানারে নির্মিত এসকল নাটকে গ্রামীণ পট-পরিসর, শহুরে মধ্যবিত্তজীবন চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। টিভি নাটকে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নদীয়া-শান্তিপুরী ধরনে বাংলা বলার ভঙ্গিকে পাল্টে দিয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। চমৎকার সংলাপ নির্মাণে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'এইসব দিনরাত্রি' (১৯৮৫) নাটকে লিউকোমিয়া আক্রান্ত শিশু চরিত্র টুনিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর কাছে এবং বিটিভি–তে প্রচুর চিঠি আসে। কিন্তু হুমায়ূন তাঁর চিত্রনাট্যে অটল থাকেন। ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রচারিত 'বহুব্রীহি' নাটকে তিনিই প্রথম টিয়া পাখির মুখে 'তুই রাজাকার' শব্দবন্ধ জুড়ে দেন। সে সময় 'রাজাকার' শব্দ ব্যবহারে নানা রকম বিড়ম্বনা হতো। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ এই সাহসী উচ্চারণ করেছিলেন।

তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর প্রতি পাঠক-দর্শকদের এক ধরনের দরদ থাকে। 'কোথাও কেউ নেই' (১৯৯৫) নাটকের 'বাকের ভাই' চরিত্রের ফাঁসির আদেশ হলে বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় মিছিল পর্যন্ত হয়েছে– 'বাকের ভাইয়ের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে'– এমনই ছিল মিছিলের শ্লোগান। হুমায়ূন আহমেদ এ বিষয়ে রমনা থানায় 'জিডি'ও করেছিলেন। তবে জীবনের শেষদিকে এসে হুমায়ূন আহমেদের নাটকে অতিরিক্ত ভাঁড়ামি যুক্ত হয়। মানুষকে হাসানোর বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়ায় অনেক উদ্ভট বিষয়ের অবতারণাও করেন তিনি।

বাংলা একাডেমির 'একুশে বইমেলা'য় হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তার নিদর্শনটি আজও চোখে পড়ার মতো। আশির দশক থেকে শুরু হওয়া এই জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েই চলছিল। কোনো এক বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদকে ভক্তকুলের হাত থেকে 'রক্ষা' করার জন্য পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তায় তাঁকে মেলা থেকে সসম্মানে সরিয়ে আনতে বাধ্য হন একাডেমি কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি ছিল এমন – হুমায়ূন আহমেদ মেলায় এসেছেন একথা শুনে তাঁর ভক্তকুল মেলায় প্রচণ্ড ভিড় করে তাঁর

অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য। পরিস্থিতি এতটাই বেসামাল হয়ে পড়ে যে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুরোধ করেন মেলা প্রাঙ্গণ ছেড়ে যেতে।

অনেক প্রকাশনী সংস্থাই হুমায়ূন আহমেদের বই মেলা উপলক্ষে প্রকাশ করেছে। সবচেয়ে বেশি প্রকাশ করেছে 'অন্যপ্রকাশ'। এখনো বইমেলায় অন্যপ্রকাশের স্টলে মেলার সবদিনই লোকসমাগম চোখে পড়ার মতো। পাঠকরা খুঁজে বেড়ান প্রিয় হুমায়ূন আহমেদকে।

হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্নের নন্দন-কানন নুহাশপল্লী। ১৯৯৭ সালে প্রায় ৪০ বিঘা বিস্তৃত এ জঙ্গলবাড়িটি তিনি ক্রয় করেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের ওপর থেকে হোতাপাড়া দিয়ে সোজা ৯ কি. মি. পথ পরেই পিরুজালি গ্রাম। কিন্তু সেই গ্রামের মূল নাম আজ নুহাশপল্লী নামের নিচে চাপা পড়েছে। এখন নুহাশপল্লী কেবল একজন লেখকের বাগানবাড়ি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত নয়, এটি একটি পর্যটন জনপদ, পিকনিক বা শুটিং স্পট হিসেবেও চিহ্নিত। হুমায়ূন আহমেদের বিদেহী পুত্রের নামে এখানে আছে একটি ঔষধি গাছের বাগান। রাশেদ হুমায়ূনের নামে এই উদ্যানটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঔষধি গাছের বাগান। এর প্রত্যেকটি গাছের চারা হুমায়ূন আহমেদের নিজের হাতে লাগানো। এখানে আছে চমৎকার কিছু ভাস্কর্যও। চা বাগানের একটা মিনিয়েচার ভার্সনও এখানে আছে। একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং বেশ কিছু চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ এবং অসংখ্য টিভি নাটকের শুটিং এখানে করা হয়েছে 'নুহাশ' চলচ্চিত্রের ব্যানারে। নুহাশপল্লী ঘিরে হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ ছিল। বিশেষ দিনে কিংবা প্রিয় কোনো ব্যক্তিত্ব এলেই তিনি সবান্ধব চলে আসতেন নুহাশপল্লীতে। নুহাশপল্লীর বড় মাঠটার মাঝখানে মার্বেল পাথরের প্লাটফর্ম দিয়ে বাঁধানো চমৎকার একটি জায়গা। তিনি বলতেন, এ জায়গাটি তিনি তাঁর মায়ের জন্য নামাজের স্থান হিসেবে বানিয়েছেন। এ চত্বরে রমজান মাসে সকলে মিলে ইফতার করতেন। নুহাশপল্লীতে 'শান্তি নিকেতন' আদলে একটি প্রতিষ্ঠান করার স্বপ্ন তাঁর ছিল আমৃত্যু।

সেন্টমার্টিন দ্বীপেও হুমায়ূন আহমেদের 'সমুদ্র বিলাস' নামে একটি ছোট্ট বাড়ি রয়েছে। তাঁর পিতৃস্থান নেত্রকোণার কুতুবপুরে তিনি নির্মাণ করেছেন 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ'। ব্যক্তিজীবনে তিনি তাঁরই সৃষ্ট দুই অমর চরিত্র হিমু ও মিসির আলীর মতোই ছিলেন রহস্যময়। হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন আড্ডাবাজ মানুষ। বন্ধুসঙ্গ পছন্দ করতেন। দেশে কিংবা বিদেশে যেখানেই বেড়াতে কিংবা শুটিংয়ের কাজে গিয়েছেন সেখানেই থাকতো অতিথিদের বিশাল বহর। 'জনতার মাঝেই খুঁজেছেন নির্জনতা'। তাঁর ধানমন্ডির 'দখিন হাওয়া' নামের বাড়িতে নিয়মিত আড্ডা হতো। অতি ঘনিষ্ঠজনেরা প্রায়ই মধ্যরাত পর্যন্ত আড্ডা দিতেন এ বাড়িতে। 'ওল্ড ফুলস ক্লাব' বা 'বৃদ্ধ বোকা সংঘ' নামে সকলে মিলে একটি ক্লাবও করেছিলেন। আলোচনা-সমালোচনায় মুখরিত থাকতো আড্ডার সময়গুলো। তবে সময়ের পরিক্রমায় তাঁর আড্ডার চেহারা ও চরিত্রে পরিবর্তনও আসতো। এ বিষয়ে শাকুর মজিদের বক্তব্য :

হুমায়ূন আহমেদ নানা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তাঁর বন্ধুভাগ্য খুব ভালো না। এক নাগাড়ে বেশি দিন কাউকেই তাঁর সহ্য হয় না ; এক বছরের বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকে না কারও সঙ্গেই।[১]

আড্ডায় অন্যের কথা শোনার চেয়ে নিজেই বলতেন বেশি। ব্যক্তি জীবনে হুমায়ূন আহমেদ ভোজন রসিক ছিলেন। নিজে খুব বেশি খেতেন না তবে আয়োজন করতেন অনেক। অন্যকে চমকে দিতে পছন্দ করতেন। অনেকগুলো জাদুও শিখেছিলেন ঘনিষ্ঠজনদের মুগ্ধ করার জন্যেই। বিশ্ব জাদুকর সংঘের সদস্যও ছিলেন তিনি। মানুষ হুমায়ূন সম্পর্কে ড. আনিসুজ্জামান বলেন–

মানুষ হিসেবেও তার অসাধারণত্ব ছিল। মানুষের সঙ্গ সাধারণভাবে তার পছন্দ ছিল। সে কৌতুকপ্রবণ মানুষ ছিল। উপস্থিত কারও সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কিংবা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনি বলে তাকে অপ্রস্তুত করতে কিংবা হাসির খোরাক করতে সে ভালোবাসত। মেঝেয় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে গল্প করে যেত। তার প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। এই প্রাণশক্তিই তার সম্মোহনের মূলে ছিল কার্যকর।[২]

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের অনেক গুণী মানুষকে সাধারণের কাছে আনতে পেরেছিলেন। সিলেটের মরমি গীতিকার হাছন রাজার গানগুলোকে প্রকাশ করতে তিনিই প্রথম উদ্যোগ নেন। তাঁর 'আজ রবিবার' নাটকের প্রতি পর্বান্তে একটি করে হাছন সঙ্গীত প্রচার করেন তিনি।
এতে তাঁর অভিপ্রায় সফল হয়েছিল। শিল্পী সেলিম চৌধুরীকে দিয়ে হাছন রাজার গানের সিডিও প্রকাশ করেন তিনি। এর ফলে হাছন রাজা পৌঁছে গেছেন অতি সাধারণের মর্মলোকে। বাউল শাহ আবদুল করিমকে সুনামগঞ্জের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সারা বাংলায়। হুমায়ূন আহমেদ তাঁকে বিটিভি-তে প্রথম 'জলসাঘর' নামের একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন। তাঁর এই উদ্যোগের কারণেই এ- গুণী মানুষটি লাভ করেছে বাঙালির শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। বাউল শিল্পী কুদ্দুছ বয়াতি, শিল্পী বারী সিদ্দিকীও এসেছিলেন হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরেই। তাঁর প্রসঙ্গে বারী সিদ্দিকী বলেন-

স্যার ছিলেন অসম্ভব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষ। আমার ভেতরের গায়ক সত্তাকে তিনি প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। 'বারী, তুমি গান গাও। গানে তুমি ভালো করবা।' হুমায়ূন আহমেদের কারণেই আমি আজ গায়ক বারী সিদ্দিকী।[৩]

হুমায়ূন আহমেদ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১), একুশে পদক (১৯৯৪), লেখক শিবির পুরস্কারসহ বহু পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। হুমায়ূন আহমেদের লেখকসত্তা বাংলা ও বাঙালির কাছে কত দিন টিকবে তা সময়ই বলে দেবে। তবে জীবিত হুমায়ূনকে প্রচুর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে বিভিন্ন আলোচনায়-লেখনিতে-সেমিনারে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় নানা সঙ্কটে সরব ছিলেন। বিভিন্ন সময়ই তিনি সংবাদপত্রের কলামে দেশের সঙ্কট ও সম্ভাবনা নিয়ে লিখেছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রবল দেশপ্রেমের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

[১]. শাকুর মজিদ, হুমায়ূন আহমেদ : যে ছিল এক মুগ্ধকর, পৃষ্ঠা-১২৫

[২].ড. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ, ২০১৩, মুখবন্ধ

[৩]. মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৭১

তবে জীবনের শেষদিকে এসে এক ধরনের বেদনাবোধে তিনি আক্রান্ত ছিলেন। স্ত্রী গুলতেকিনের সাথে ডিভোর্স হয়ে গেলে সন্তানরাও তাঁর সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়। তাঁর অতি আদরের মেয়ে নোভার বিয়েতেও তিনি থাকতে পারেননি। ছেলেমেয়েদের কাছে টানতে এক নিসঃঙ্গ পিতার হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতে তিনি 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' নামে একটি চলচ্চিত্রও বানিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে হুমায়ূন-পরিবার নানা ধরনের সঙ্কটে পড়ে। এসবের মধ্যে অর্থসংকটই ছিল তীব্র। মা আয়শা ফয়েজ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে সন্তানদের বড়ো করেছেন। সে সব দিনের কথা হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস 'জোছনা ও জননীর গল্প', 'মাতাল হওয়া' ও 'দেয়াল' গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথায় সমকালীন নানা প্রসঙ্গ, নিজের লেখার মূল্যায়ন, সমাজ-ধর্ম-দর্শনের নানাদিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে নিজেরই সমালোচনা করছেন এভাবে –

> কিছু কিছু লেখাতে, আমি জানি, যদি আরেকটু সময় দিই, আরেকটু বেশি চিন্তা করি, আরেকটু ঠাণ্ডা মাথায় লিখি, খুব সুন্দর করে আমি শেষ করতে পারি। এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করি। এক ধরনের চাপ বোধ করি। এবং দ্রুত শেষ করে ফেলি। একবার শেষ করার পর মনে হয়, এটা কী করলাম? তবে নিজের লেখা সম্পর্কে আমার অহঙ্কার অনেক বেশি।[১]

অন্যত্র তিনি বলছেন–

> ক. লেখালেখির মধ্যে আমি কখনো ভান করি না। ব্যক্তিজীবনেও ভানের অংশ কম। লেখালেখিটা আমার কাছে উপাসনার মতো।[২]
>
> খ. যেটা লিখছি, সেটা বিশ্বাস করে লিখতে হবে। লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাটা জরুরি।[৩]

সাহিত্যের চরিত্রনির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> সাধারণত আমি চেহারার বর্ণনা দিই না। আমি এই ব্যবস্থাটা করি। ডায়ালগের ভেতর দিয়েই যেন পাঠক চরিত্রগুলোকে কল্পনা করতে পারে। এটার সুবিধাটা দেখো। আমরা 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসটা যখন পড়ি,তখন প্রত্যেকেই একজন করে দুর্গাকে কল্পনা করি। একটা অপু কল্পনা করি। সত্যজিৎ রায় যখন ছবি বানালেন, তখন সবার কল্পনাটা সীমিত হয়ে গেল।[৪]

[১]. বসন্ত বিলাপ, হুমায়ূন আহমেদ, প্রথমা, পৃষ্ঠা-১২৩-১২৫

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৩১

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৩৭

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৪৫

বাংলা সাহিত্যের দুই শক্তিমান লেখক–বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হুমায়ূনের প্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁদের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য :

> বিভূতিভূষণ আমার অসম্ভব প্রিয়। এবং তাঁর যে কী পরিমাণ ক্ষমতা! তাঁর চরিত্র সৃষ্টির যে ক্ষমতা এবং মানুষের প্রতি তাঁর যে মমতা, এগুলো যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে, তা দেখার জন্য বিভূতিভূষণ পড়া দরকার। আমি খুব আনন্দিত হতে পারতাম যদি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'জননী' উপন্যাসটা লিখতে পারতাম।[১]

হুমায়ূন আহমেদ একসময় অনেক অর্থ-কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তবে খুব দ্রুত তিনি এ পরিস্থিতি সামলে ওঠেন। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে লেখালেখি করে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারা লেখকদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। মানবতার অন্বেষণ হুমায়ূন আহমেদের মূল আরাধনা ছিল। এ বিষয়ে তাঁর ভাবনা–

> আমার কাছে মানবিক সম্পর্ক রাজনীতির চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়।[২]

মানুষের স্বল্পায়ু নিয়ে এই শিল্পদ্রষ্টার ছিল দুঃখবোধ। যেমন –

> একটা সাধারণ কচ্ছপ ৩০০-৪০০ বছর বাঁচে। অথচ মানুষের মতো বুদ্ধিমান একটা প্রাণী বাঁচে বড়জোর শ' খানেক বছর। বিশাল দুঃখের ব্যাপার।[৩]

২০১১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর হুমায়ূন আহমেদের কোলন-ক্যান্সার ধরা পড়ে সিঙ্গাপুরে। উন্নত চিকিৎসার জন্য নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোয়েন-কেটারিং হাসপাতালে ভর্তি হন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রি.। হুমায়ূন আহমেদের কেমোথেরাপি চলতে থাকে দীর্ঘদিন । তাঁর মৃত্যুকালে পাশে থাকা এক নিকটজন হুমায়ূন আহমেদের শেষ দিনের নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন:

> ১৯ জুলাই ২০১২ : দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের দিকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন হুমায়ূন আহমেদ। ১টা ২২ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময় তাঁর শরীরের কোনো অংশটি আর কাজ করছিল না। হৃদযন্ত্র, ব্লাড প্রেসার সচল রাখতে সর্বোচ্চ মাত্রার ওষুধের সাথে ১০০% অক্সিজেন দেওয়ার পরও সেটা নিতে সক্ষম ছিলেন না তিনি। এ অবস্থায় শেষ হয়ে যায়-সব প্রচেষ্টা। ঘোষণা করা হয় তিনি আর নেই। মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় সেপসিস ব্যাকটেরিয়া।[৪]

২৪ এ জুলাই ২০১২ খ্রি. নুহাশপল্লীর লিচু গাছ তলায় তাঁকে সমাহিত করা হয় ।

প্রায় ৬৪ বছরের আয়ুষ্কালে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন অসম্ভব রকম সৃষ্টিশীল। তাঁর সাহিত্যিকজীবন ছিল বহুমাত্রিকতায় সমৃদ্ধ। তাঁর সাহিত্যকর্ম কালান্তরের পাঠকের কাছে সমাদর অর্জনে সক্ষম হবে কি না তা বলা অসম্ভব; কিন্তু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় – জীবদ্দশায় তিনি যে বিপুল পাঠক তৈরি করে গেছেন তা বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে অন্য কোনো লেখকের পক্ষে অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। হমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের সাহিত্যের সেই বরপুত্র, যিনি পাঠকচিত্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন মুগ্ধতার আবেশ।

[১]. বসন্ত বিলাপ, হুমায়ূন আহমেদ, প্রথমা, পৃষ্ঠা-১১৫

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১৫৪

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১৩৯

[৪]. বিশ্বজিত সাহা, হুমায়ূন আহমেদের শেষ দিনগুলো, পৃষ্ঠা-৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের অবস্থান

বাংলা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ রূপকল্প ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিত্য সৃজনশীল পরিচর্যায় বাংলা ছোটগল্পের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে আরো ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। রবীন্দ্র-যুগ, রবীন্দ্রোত্তর যুগ এবং ভারত-বিভাগোত্তর পর্বে বিচিত্র সৃষ্টিশীলতায় ছোটগল্পের বিষয় ও প্রকরণে যুক্ত হয়েছে বিভিন্নমাত্রিক রূপৈশ্বর্য।

ভারতবিভাগের পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলা ছোটগল্পে তৈরি হয় দুটো ধারা। ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলাদেশের ছোটগল্পের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে গ্রামীণ জীবন ও পটপরিসর। কেউ কেউ স্বল্পপরিসরে নাগরিক জীবনকেও গল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। বাঙালির ভাষা-আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ – এইসব উত্তাল ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের ছোটগল্পে নিয়ে এসেছে বিষয় ও বিষয়ীর বৈচিত্র্য। সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী গল্পকারদের হাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের ছোটগল্প। এসময়ের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংশয়-প্রত্যয়, আশা, স্বপ্নবুনন ও স্বপ্নভঙ্গের বিচিত্রমাত্রিক বিষয় শিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের কথাকার রচিত ছোটগল্পের প্রধান বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশকালের পটে কথাশিল্পীরা সন্ধান করেছেন ছোটগল্পের বিষয় ও প্রকরণ। তাঁদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) অন্যতম। বাংলা কথাসাহিত্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা এই সাহিত্যিকের রচনার পরিমাণ বিপুল। মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সংকট ও সম্ভাবনা, প্রেমভাবনা, রাজনৈতিক-দর্শন তথা জীবনের বিচিত্রমাত্রিক রূপায়ণের যথার্থ রূপকার তিনি। নাগরিক জীবন বর্ণনায় তাঁর মধ্যে ছিল না কোনো ভণিতা।

বাংলাদেশের ছোটগল্পে হুমায়ূন আহমেদের অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে এবং তাঁর সমকালে রচিত বাংলা ছোটগল্পের প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

বিভাগোত্তর কালে, বিশেষত চল্লিশের দশকের শেষ পর্যায়ে এবং পঞ্চাশের প্রথম দশকে ছোটগল্প রচনায় যাঁরা ব্রতী হন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদদীন (১৯১৮-১৯৮৬), শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১), আবু ইসহাক (১৩২৬-২০০৩), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-), মিন্নাত আলী(১৯২৭-), শহীদ সাবের (১৯৩০-১৯৭১),আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), জহির রায়হান(১৯৩৩-১৯৭২), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) প্রমুখ শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্পের প্রধানতম পটভূমি গ্রাম। ঢাকা শহরের প্রকৃত নগরায়ণ বিলম্বিত হওয়ায় শিল্পসাহিত্যে নাগরিক চেতনা তখনো অনুপস্থিত। আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের কোনো কোনো গল্পে নাগরিক জীবন বৈচিত্র্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হতে আরম্ভ করে নানামাত্রিক শৈল্পিক উৎকর্ষে।

এ সময়ের ছোটগল্পের মূলবিষয় ছিল যুদ্ধ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মন্বন্তর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দাঙ্গা ইত্যাদি। গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশের গ্রামজীবন। যাপিত জীবনের সঙ্কট ও সমস্যার আলেখ্য রচনাই এ পর্বের গল্পকারদের মূল প্রবণতা। যুদ্ধ, দাঙ্গা, অসঙ্গতি, অসাম্য এবং এসব থেকে মানবিক মুক্তিকামনার প্রোপাগান্ডা নির্মাণ করাই ছিল মানবতাবাদে প্রত্যয়ী শিল্পীদের মূল কাজ। সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কেউ কেউ। সামাজিক বৈষম্য, কৃষকজীবনের দুর্গতি, ধর্মজীবীর ভণ্ডামি এবং ইসলামি মূল্যবোধ ওঠে এসেছে কারো কারো গল্পে। নিম্নবিত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-সংগ্রামকে গল্পের বিষয় করেছেন অনেক ছোটগাল্পিক। নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রেম-অপ্রেম, আনন্দ- বেদনা, স্বপ্ন-সংগ্রাম ওঠে এসেছে বেশকিছু গল্পে। মানুষের অবচেতন মনের আকাঙক্ষা, লিবিডোতাড়না এবং কালিক নির্বেদ নিয়েও গল্প লিখেছেন দু-একজন সাহিত্যিক। প্রগতিশীল সমাজচিন্তা, প্রাগ্রসর সমাজের জন্য উজ্জ্বল আশাবাদ, মানবমনের গভীরতর রহস্যলোকে আলোক প্রক্ষেপণ করেছেন কেউ কেউ। মনোগহনের জটিলতা ও অসঙ্গতি উন্মোচন, মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নিয়ে গল্প লিখেছেন এ সময়ের গল্পকাররা।
পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণে সমৃদ্ধ। সে সময়ের গল্পের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

> পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্প সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বোধ করি এই যে, আমাদের ছোটগল্প এ-পর্বেই প্রথম হয়ে ওঠে মৃত্তিকামূলস্পর্শী ও জাতিসত্তার শিকড়অন্বেষী। গল্পকাররা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকরণ–পরিচর্যার প্রতিও ক্রমশ মনোযোগী হয়ে উঠেন এ কালখণ্ডে। বিষয়াংশ উপস্থাপনার অভিনবত্ব এবং নিরীক্ষাশীল ভাষারীতি দিয়ে এ-পর্বের শিল্পীরা সূচিত করে দেন ষাটের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের প্রকরণ প্রসাধনের ঋদ্ধ পথযাত্রা।[১]

ষাটের দশকের গল্পকারদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন মুর্তজা বশীর(১৯৩২-), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-), শওকত আলী (১৯৩৬-), বশীর আল হেলাল (১৯৩৬-), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-), হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৯-), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-), রাহাত খান (১৯৪০-), রশীদ হায়দার (জন্ম : ১৯৪১), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৫-১৯৯৯), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), আবদুল মান্নান সৈয়দ (জন্ম : ১৯৪৩), সেলিনা হোসেন (জন্ম : ১৯৪৭) প্রমুখ।

[১]. ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৮৪

এ-পর্বের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যে আছে নাগরিক মধ্যবিত্তের অতলযাত্রা আর অন্তঃসারশূন্যতা। গল্পে এসেছে নাগরিক মধ্যবিত্তের বিকৃতি, অসঙ্গতি ও সদর্থক জীবনচেতনায় উত্তরণের ইতিকথা। গল্পে আছে পলায়নী মনোবৃত্তি, ফ্রয়েড-এলিসের দ্বারা প্রভাবিত জীবনাচরণ। সমকালচঞ্চল জীবনাবেগ, সমকালযন্ত্রণা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ-বিদ্রোহের স্বরূপ এ সময়ের গল্পের মূল প্রবণতা। বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টি, সমাজজীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার ও বঞ্চনার চিত্র এ পর্বে অলক্ষ্য নয়। পুরনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণুতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা ও জীবনসংগ্রাম চমৎকার ভাবে ওঠে এসেছে।

ষাটের দশকের ছোটগল্পের মূল প্রবণতা নিম্নরূপ :

> আমাদের ছোটগাল্পিকেরা গ্রামীণজীবন চিত্রণে যতটা স্বচ্ছন্দ বস্তুনিষ্ঠ, নগরজীবন চিত্রণে ততটা নন। তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় কথাসাহিত্যের প্রভাবে এ পর্বে নবীন ছোটগাল্পিকদের রচনায় এসেছে আধুনিক নাগরিকচেতনা, লিবিডোতাড়িত মনোবিকলন এবং যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী অবক্ষয়ীচেতনা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ সংক্ষুব্ধ পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কটও এ-সময়ের ছোটগল্পে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের তুলনায় এ পর্বের ছোটগাল্পিকরা অনেক বেশি আঙ্গিকসচেতন ও প্রকরণনিষ্ঠ; বিষয়াংশ-নির্বাচন, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ পরিচর্যায় অধিকাংশ ছোটগাল্পিক পরীক্ষাপ্রবণ ও বৈচিত্র্যসন্ধানী।[১]

সত্তর এবং আশির দশকের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকাররা হলেন– কাজী ফজলুর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, মকবুলা মনজুর, আল মাহমুদ, জুবাইদা গুলশান আরা, আমজাদ হোসেন, আবু কায়সার, আবুল হাসান, বুলবুল চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, আহমদ বশীর, ইমদাদুল হক মিলন, মইনুল আহসান সাবের, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সত্তর দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে শাসকশ্রেণির প্রতারণা অন্যদিকে বাঙালির স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা। এরপর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় বাঙালির বহুল কাঙ্ক্ষিত অর্জন। এসব ঘটনা প্রবাহের স্পর্শ আছে ঐ সময়ের কথাসাহিত্যে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমন নেই, আছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। সত্তরের দশকের গল্পের বিষয় সম্পর্কে ওই দশকেরই একজন গল্পকারের অভিমত নিম্নরূপ :

> সত্তরের গল্পকাররা প্রত্যেকে বয়সে নবীন। কিন্তু সমাজ, মানুষ, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে গল্প রচনায় নবীন নন। স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনার প্রতি রয়েছে তাঁদের তীব্র চাউনি। যুদ্ধোত্তর সংকট, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, '৭৪ এর দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, সামরিক অভ্যুত্থান এবং শাসকশ্রেণির প্রতারণার বাস্তবতা সত্তরের গল্পকারদের জীবন্ত বিষয়।...
>
> সত্তর দশকের সমস্ত গল্প লেখকদের গল্পের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্বলিত কথাবস্তু।[২]

[১] ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৯২

[২] সুশান্ত মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: দ্বৈরথ সময়, আজকের কাগজ, ঢাকা, ১৫.৮.১৯৯১

মূলত সত্তরের দশকের ছোটগল্পের যে বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ পরিচর্যা তা পরবর্তী আরও দুই-তিন দশক পর্যন্ত ক্রিয়াশীল আছে। হুমায়ূন আহমেদ সত্তরের দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়পর্বে গল্প লিখে গেছেন। তবে সত্তর-আশি-নব্বই – এই তিন দশকেই মূলত তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলো রচিত হয়েছে।

আলোচনার এ পর্বে হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য এবং প্রকরণ পরিচর্যায় বাংলাদেশের ছোটগল্পে তাঁর স্বাতন্ত্র্য কতটুকু তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে আখ্যানের কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে প্রায়ই উৎকেন্দ্রিক বা খামখেয়ালি মানুষ । এ ধরনের খামখেয়ালি দু একটি চরিত্র অন্যান্য গল্পকারদের গল্পে সাধারণত পার্শ্বচরিত্র হিসেবে স্থান পেলেও হুমায়ূন আহমেদ তাঁদের নিয়ে এসেছেন কাহিনির কেন্দ্রে। 'বুড়ি', 'কুকুর', 'জুয়া', 'নিমধ্যমা', 'অচিনবৃক্ষ', 'আনন্দ-বেদনার কাব্য', 'সুলেখার বাবা' প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'বুড়ি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক আমেরিকান বৃদ্ধা। গল্পের আখ্যানে বুড়ি যেসব কার্যকলাপ প্রদর্শন করে তাতে তার খামখেয়ালি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে। রাত-দিন ব্যাগ পাইপ বাজিয়ে অন্যদের বিরক্ত করা, কারণে-অকারণে পার্টি করে হাউসমেটদের ত্যক্ত করা এসবই ছিল তার খেয়ালিপনা। কিন্তু গল্পের শেষে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বুড়ি যখন বলে–

> তোমাদের কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রার্থনা করার ব্যাপার আছে।.... ব্যাগ পাইপ কেন বাজাতাম জান? একা একা থাকতে এত খারাপ লাগত। কুৎসিত বাজনাটা বাজালেই তোমরা কেউ না কেউ আসতে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারতাম। স্যরি। তোমাদের কষ্ট দিয়েছি।[১]

বুড়ির হৃদয়াবেগ প্রকাশের পর গল্পটি আর খেয়ালিপনার উদ্ভট আখ্যান বলে মনে হয় না। মাতৃরূপী একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, যে খুঁজে বেড়ায় মানুষের সঙ্গ সে মানুষটির প্রতি পাঠকের একধরনের মমতা তৈরি হয়। গল্পটি হয়ে ওঠে বিশ্বসাহিত্যের এক আখ্যান যা জগতের প্রতিটি নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ মানুষের এপিগ্রাম।

প্রান্তিক মানুষের জীবনাচরণ বর্ণনায় হুমায়ূন আহমেদ যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত বেকার জীবনের হতাশা, গ্লানি, ব্যর্থতার স্বরূপ এঁকেছেন বিশ্বস্ত শব্দের বুননে। গ্রাম কিংবা নগর– উভয় জীবনের যথার্থ বিবরণ হুমায়ূন আহমেদের গল্পকে করেছে শিল্পমণ্ডিত। তিনি শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক বেকার জীবনের যথার্থ রূপকার।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৯

'একটি নীল বোতাম', 'একজন ক্রীতদাস', 'আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ'– এই তিনটি গল্পে নাগরিক জীবনের ক্লেদাক্ত দিক ওঠে এসেছে। নগরে বেকার জীবন যে কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে তার বিশ্বস্ত বর্ণনা রয়েছে গল্প তিনটিতে। বেকার জীবনেও স্বপ্ন আছে; স্বপ্ন আছে প্রেমের, পরিণয়ের। সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় না। তবু মানুষ স্বপ্ন দেখে। একটি সুখী সুন্দর জীবনের স্বপ্ন –

> সবই খুব সুন্দর সুখের কল্পনা। তবু এক এক রাতে কষ্টে চোখে জল আসে। সারারাত জেগে বসে থাকি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, আমার এই জীবনটা আমি কি কিছুতেই বদলাতে পারি না?[১]

জীবনকে বদলানোর কিছুটা আয়োজন চলে বটে কিন্তু অন্তিমে ধ্রুব হয়ে থাকে ক্লেদাক্ত মেস জীবনটাই।

'একজন ক্রীতদাস' গল্পের নায়কের চরিত্রটি অসাধারণ। বেকারত্ব মানুষের জীবনকে কী ভয়ঙ্কর রূপে গ্রাস করে তার নিখুঁত নির্মাণ এ গল্পের নায়ক চরিত্রটি। এ জীবনেও স্বপ্ন আছে আর আছে স্বপ্ন ভাঙার ক্রন্দন –

> শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত ভাবলাম ব্যবসার অবস্থাটা অল্প একটু ভালো হলেই একটি সরল দুঃখী-দুঃখী চেহারার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবো এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পারুলের হৃদয়হীনতার গল্প করতে করতে হা হা করে হাসব।[২]

তবে 'ব্যবসার অবস্থাটা' ভালো হয়ে ওঠে না বলে নগর জীবনের নিষ্ঠুরতায় আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ছেলেটি –

> সহায়-সম্বলহীন একটি ছেলের কাছে এ শহর যে কী পরিমাণ হৃদয়হীন হতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। নিষ্ঠুর এবং অকরুণ এই শহরে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সে সময় সারাক্ষণই খিদের কষ্ট লেগে থাকত। ফুটপাতের পাশে চটের পর্দার আড়ালে ভাতের দোকানগুলি দেখলে মন খারাপ হয়ে যেত। দেখতাম রিকশাওয়ালা শ্রেণির লোকেরা উবু হয়ে বসে গ্রাস পাকিয়ে মহানন্দে ভাত খাচ্ছে। চুম্বকের মতো সেই দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করত।[৩]

হুমায়ূন আহমেদ সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে আবিষ্কার করেছেন। সাধারণ স্কুল শিক্ষক, অফিসের কেরানি, কুলি, রিকশাচালক, বই লেখক, প্রুফরিডার , কাজের বুয়া– এইসব অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসাধারণত্বকে আবিষ্কার করেছেন তিনি। নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষক জীবনের কথকতা নির্মাণ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। 'জুয়া', ' খেলা', 'অচিনবৃক্ষ', 'জাদুকর', 'পাথর', '১৯৭১', 'নিউটনের ভুল সূত্র', 'কল্যাণীয়াসু' গল্পে শিক্ষকের জীবনকথা আছে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২২

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৯০

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৯০

শিক্ষক চরিত্রের কেউ কেউ সিরিয়াস আবার কেউ কেউ 'ফানি ম্যান' টাইপ। হুমায়ূন আহমেদ নিজে শিক্ষক ছিলেন বলে শিক্ষকতার সিরিয়াস দিকটা ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণভাবে। আবার তাঁর শিক্ষকদের কেউ কেউ ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের, যাঁদের মধ্যে ছিল 'ভালো মানুষি' কিংবা স্বভাব সুলভ রসিকতা। হুমায়ূন আহমেদ বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাঁর সৃষ্ট শিক্ষক চরিত্রগুলো অনন্য হিসেবে নির্মাণ করেছেন।

হাইস্কুলের শিক্ষক প্রণব বাবু। সহায়সম্বলহীন মানুষ তিনি। এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। অর্থাভাবে নিজে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি। স্ত্রী মারা গিয়েছে সেই কবে। একমাত্র ছেলে থাকে ময়মনসিংহে। কদিন আগে নাকি চুরির মামলায় ধরা পড়েছিল সুবল; প্রণব বাবুর ছেলে। মেয়ে মাস দুয়েক আগে কিছু টাকা চেয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে একটি চিঠি লিখেছিল। তিনি চিঠির উত্তর কিংবা টাকা কোনোটাই দিতে পারেননি। কিছুদিন পরে রেডক্রস লটারির প্রথম পুরস্কার দু-লক্ষ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু প্রণব বাবু জানেন এই টাকা তার সন্তানদের সুন্দর শৈশব দিতে পারবে না। সুখময় একটি গার্হস্থ্য জীবন তাকে কেউ দিবে না। আর তাই তিনি দু লক্ষ টাকার টিকিট পকেটে নিয়ে নিঃস্ব মানুষের মতো ছেলেকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকেন।

'খেলা' গল্পে আছে একজন ত্যাগী, নির্মোহ ও আদর্শবান শিক্ষকের গল্প। খায়রুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের থার্ড স্যার বাবু নলিনি রঞ্জন। দাবা খেলায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন তিনি। নিয়মতপুরবাসীর গৌরব শিক্ষক নলিনি বাবু। পনেরো বছরে তিনি কারো কাছে দাবায় হারেননি। দাবার জগতের একজন মুকুটহীন সম্রাট তিনি। তিনি শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে স্কুলের চাকরি থেকে রিটায়ার করলেন। একদিকে হাঁপানি, অন্যদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিপর্যস্ত নলিনি বাবু। তাঁর অবসরে যাওয়ার দিন স্কুল কমিটির সেক্রেটারি সকলের সামনে ঘোষণা করলেন– নলিনি বাবুকে দাবায় কেউ হারাতে পারলে তাকে পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। আর যদি নলিনি বাবু জিতে যান তবে টাকা থাকবে স্কুলের ফান্ডে। নলিনি বাবুর বন্ধু জালাল সাহেব বহু কষ্টে নলিনি বাবুকে রাজি করালেন এবং বললেন যে খেলায় আজ তিনি জিতবেন; হেরে যাবেন নলিনি বাবু। জালাল সাহেব যে টাকাটি পাবেন তা দিয়ে চিকিৎসা হবে নলিনি বাবুর। খেলা চলল। জীবনের শেষ খেলাটিতে বহু চেষ্টা করেও নলিনি বাবু হারতে পারলেন না। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন নলিনি বাবু। দরিদ্র স্কুলটির ফান্ডে জমা হলো পনেরো হাজার টাকা। এমন সাদা মনের মানুষ, নির্মোহ ও ত্যাগী শিক্ষকের চমৎকার চরিত্রটি হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত দরদ দিয়ে অঙ্কন করেছেন। অপরাজিত থাকার চিরায়ত মানসিক প্রবৃত্তি এবং পার্থিব লালসার কাছে পরাজয় স্বীকার না করার অনন্য মহিমা নলিনি বাবুকে মহান করে তুলেছে।

জীবনযুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ, স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টারের জীবন কথা আছে 'অচিনবৃক্ষ' গল্পে। এ চরিত্রটিও সিরিয়াস টাইপের। হেডমাস্টার সাহেব শিক্ষিত বটে কিন্তু তাঁর আছে অন্ধবিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করেন গ্রামের শেষ সীমায় যে অচিন বৃক্ষটি আছে সেখানে একদিন

ফুল ফুটবে। সেই ফুলের রস খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে তাঁর স্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে এটি হেড মাস্টার সাহেবের অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার নয়; এটি হলো বিত্তহীন একজন মানুষের প্রকৃতির ওপর আস্থা এবং ভরসা । দুই লাখ টাকা খরচ করে তিনি পারছেন না হার্টের বাল্ব সংযোজন করে রোগাক্রান্ত স্ত্রীকে সুস্থ করে তুলতে। সুতরাং প্রকৃতির মিরাকলে বিশ্বাস করা ছাড়া তার আর কী উপায় থাকতে পারে?

স্ত্রীর প্রতি করুণামিশ্রিত অসাধারণ ভালোবাসা আছে মাস্টার সাহেবের। স্ত্রীর কবিতা লেখার প্রতিভার কথা, মেট্রিকে লেটার মার্কসহ পাশ করা, রান্নার প্রশংসা কোনোটিই বাদ যায় না। অপেক্ষায় দিন গুনছেন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের, যেদিন ফুটবে অচিন বৃক্ষের ফুল –

> ফুল ফুটার আগে পচা শ্যাওলার গন্ধ ছাড়ার কথা। গাছ সেই গন্ধ ছাড়া শুরু করেছে। আর কেউ সেই গন্ধ পায় না। আমি পাই।[১]

‘জাদুকর’ গল্পে আছে অনন্য এক শিক্ষকের চরিত্র। কোমলে-কঠোরে যিনি চমৎকার মানুষ। ধীরেণ স্যারকে আড়ালে ছাত্ররা ডাকে ‘যম স্যার’। সকলে তাকে যমের মতো ভয় পায় বলেই এই নামকরণ। ধীরেন স্যার ছাত্রদের অঙ্ক করান। বাবলু নামের এক ছাত্র অঙ্কে সাড়ে আট পাওয়ায় তিনি খাতার ওপর লাল কালিতে বড় করে লিখে দিয়েছিলেন ‘গরু’। অবশেষে বাবলুকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে তার বাবা ও ধীরেণ স্যার তাকে খুঁজতে লাগলেন। ধীরেণ স্যার অনুশোচনায় জর্জরিত হলেন– ‘আহারে বাচ্চা ছেলেটা কোথায় না কোথায় বসে আছে অন্ধকারে। খাতায় গরু লেখাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।’ আবার বাবলুকে খুঁজে পেয়েই তিনি ধমকাতে শুরু করলেন– ‘আগামীকাল তুই সারা পিরিয়ড আমার ক্লাসে নীলডাউন হয়ে থাকবি। গরু কি আর সাধে লিখেছি।’

ছাত্রদের সন্তানের মতোই শাসন আবার পিতৃস্নেহে শিক্ষাদান করার মতো বিস্ময়কর গুণ ধীরেণ স্যারদের করেছে মানুষ গড়ার চমৎকার কারিগর।

‘পাথর’ গল্পে পাওয়া যায় ইংরেজি সাহিত্যের এক অধ্যাপকের চরিত্র। তিনি বিপত্নীক। কোনো দোষ তার চরিত্রে নেই বটে কিন্তু তিনি তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটি মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আর সে প্রশ্রয় প্রেমের। চিত্রা নামের মেয়েটির ছিল ভুল করার বয়স। কিন্তু জোবেদ আলী নামের শিক্ষকটির ভুল করার বয়স নয়। অসম এই প্রেমের ফল হয়েছে জোবেদ সাহেবের অস্বাভাবিক মৃত্যু। চিত্রার মা ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে জোবেদ সাহেবকে। জোবেদ সাহেবের ছিল মুগ্ধ করার ক্ষমতা।

কথা দিয়ে কৌশলে তিনি মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন। চিত্রার যে বয়স ছিল তা মুগ্ধ হওয়ার বয়সই। ফলে জোবেদ সাহেব খুব সহজেই চিত্রাকে কাছে টানতে পেরেছিলেন। এ চরিত্রটি নির্মাণে হুমায়ূন আহমেদ অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩২৮

‘উনিশ শ একাত্তর’ গল্পে আজিজ মাস্টারের আকস্মিক ও অভাবিত সাহস পাঠককে সত্যিই ভাবিত করে। দেশপ্রেমে জাগ্রত একজন মানুষ কী প্রচণ্ড ঘৃণা ও সাহস নিয়ে পাকিস্তানিদের তিরস্কার করেছে তা বিস্ময়কর। আজিজ মাস্টার হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ নির্মাণ।

‘নিউটনের ভুল সূত্র’ গল্পে একজন সিরিয়াস, আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক চরিত্র ও ‘কল্যাণীয়াসু’ গল্পে একজন লোভ-লালসাহীন, সহজ-সরল শিক্ষক চরিত্রের যথার্থ নির্মাণ লক্ষ করা যায়।

‘নিউটনের ভুল সূত্র’ গল্পে অমরনাথ বাবু সংসার ত্যাগী মানুষ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। স্কুলের দোতলার একটি ঘরে তিনি বাস করেন। ছাত্রদের সাথে কখনো হাসি-তামাসা করেন না। ক্লাসের সামনে এসে ঘড়ি দেখে ক্লাসে প্রবেশ করেন। ঘড়ি দেখে ক্লাস থেকে বের হন। ঘন্টা পড়লে ঘড়িতে চোখ রেখে হতাশা ও সন্দেহ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। ছাত্রদের কাছে তিনি ‘ঘড়ি স্যার’ নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের জটিল সব বিষয় বিরস মুখে জলের মতো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন তিনি। তাঁর মতে –

> সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোনো ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়াবার সময় তুমি হেসেছ, তার মানে তুমি বিজ্ঞানকে উপহাস করেছ।[১]

ঠাট্টা তামাশা তিনি পছন্দ করেন না। কেউ ঠাট্টা-তামাশা করলে কঠিন চোখে তিনি তাকিয়ে থাকেন। নিজের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান পড়াতে পারেননি। এ নিয়েও তার আফসোসের সীমা নেই। তার ছেলে সম্পর্কে তিনি বড়ই হতাশ –

> গাধা ছেলে, মেট্রিকটা তিনবারেও পাশ করতে পারেনি। জগতের আনন্দময় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কিছুই জানল না–আলো কী সেই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আলো কী জিজ্ঞেস করলে নির্ঘাৎ বলবে–এক ধরনের তরকারি, ভর্তা করেও খাওয়া যায়। ছিঃ ছিঃ।[২]

হুমায়ূন আহমেদের জীবনকথা পড়ে বোঝা যায়, শিক্ষক চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নির্মাণ করেছেন তিনি। তাঁর সমকালে রচিত কোনো কথাসাহিত্যে শিক্ষকদের এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ গাথা দুর্লভ।

সমকালীন রাজনৈতিক নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হুমায়ূন আহমেদ। ফলে স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদদের তিনি চিনেছেন নির্ভুলভাবে। হুমায়ূন আহমেদ রাজনীতিবিদদের চরিত্র নির্মাণ করেছেন ‘মন্ত্রীর হেলিকপ্টার’ ও ‘ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য’ নামের গল্পদ্বয়ে। মেকি ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং অন্তঃসারশূন্য রাজনীতিকের চরিত্র নির্মাণে তিনি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। মানবিকতাহীন রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

১. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৮০

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-২৮৪

আব্দুল কাদের জোয়ার্দার মন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম গ্রামে যাচ্ছেন। তিনি চাচ্ছেন হুলস্থূল কোনো ব্যাপার ঘটুক। তিনি যাবেন হেলিকপ্টারে। পুলিশ তাকে গার্ড অব অনার দেবে। দশ গ্রামের লোক তাকে দেখতে আসবে। পুরো এলাকা লোকে লোকারণ্য হবে। কিন্তু তিনি ভরসা করতে পারছেন না। তাঁর পিএসটার মধ্যে ভ্যাবদা ধরনের ভাব আছে। চেহারা দেখে মনে হয় টিউশনি করে জীবন চালায়। ল্যাদল্যাদা কয়েকজন পুলিশকে দেখে তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হলো। দেশ থেকে স্মার্টনেস ওঠে গিয়েছে। অনেক কষ্টে হেলিকপ্টার যোগাড় হলো। মন্ত্রী চান ফেরার পথে হেলিকপ্টারে করে একজন রোগীকে ঢাকায় আনা হবে। এতে গ্রামের মানুষের মুগ্ধতা বাড়বে। তবে রোগী হতে হবে সিরিয়াস টাইপের। আমাশয়ের রোগী হলে হবে না। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করলেন

> এতে ডাবল পারপাস সার্ভ হবে। নাম্বার ওয়ান– গ্রামের মানুষদের প্রতি আমার মমতা প্রকাশ পাবে। নাম্বার টু–একজন দরিদ্র ব্যক্তি হেলিকপ্টারে ঘুরবে। এই গল্প সে বাকি জীবন সবার সঙ্গে করবে।[২]

অনুষ্ঠান শেষে একজন রোগীকে হেলিকপ্টারে তোলা হল। তবে রোগী থেকে থেকে খাবি খাচ্ছে। রোগীর এখন-তখন অবস্থা। মন্ত্রী ত্যক্ত-বিরক্ত হলেন। ঘাটের মরাকে তুলে আনা মহা ভুল হয়েছে। রোগীকে শেষ পর্যন্ত গ্রামেই ফিরিয়ে নেওয়া হল। 'মৃত্যু মায়ের কোলে হওয়াটাই ভালো'-– কথাটি মন্ত্রী মহোদয় সকলকে বোঝালেন। রোগী মারা গেল। জানাজা শেষে তিনি অসাধারণ একটি বক্তৃতা দিলেন। অনেকে কেঁদে ফেলল। প্রতিদিনের মতো একটি সফল প্রোগ্রাম করে তিনি ঘরে ফিরলেন।

স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদরা লোক দেখানো, আয়োজন সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপে গণমানুষকে নিয়ে শুধু তামাশাই করেন। মানবিকতার কথা তারা বলেন বটে কিন্তু তাতে নেশা ধরে না। অন্তঃসারশূন্য বুলিই এদের সম্বল।

'ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য' গল্পেও একই ধরনের আয়োজন সর্বস্বতা লক্ষ করা যায়। ফজলুল সাহেব লঞ্চ ভাড়া করে, ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে দলবল নিয়ে গেলেন ত্রাণ সাহায্য দিতে। নানা ধরনের জটিলতায় রান্না করে নিয়ে যাওয়া খিচুরি নষ্ট হলো। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সাতাশি টাকা তেপান্ন পয়সার সবটাই কলা গাছের ভেলায় ভাসতে থাকা একটি পরিবারকে দেওয়া হলো। সঙ্গে আনা তাঁবুর একটি তাদের দিতে চাইলে তারা তা নিল না। তারা উঠে এলো লঞ্চে। পরিবারটির সঙ্গে থাকা ছোট মেয়েটি লঞ্চে ওঠেই হড়হড় করে বমি করল। ফজলুল করিম সাহেব আঁৎকে উঠলেন এবং বাকি সময়টা তিনি ক্যাবিনে দরজা আটকে বসে থাকলেন। তাঁর জ্বর এলো। পরদিন পত্রিকায় যে সংবাদ ছাপা হলো তা প্রকৃতই বাংলার সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের ডিসকোর্স –

[১] গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩০৩

অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় জনশক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজলুল করিম একটি ত্রাণ দল পরিচালনা করে বন্যা মোকাবিলায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে তুলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পুরো চব্বিশ ঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে বর্তমানে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। জনশক্তি মন্ত্রী জনাব এখলাস উদ্দিন হাসপাতালে তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন– বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ফজলুল করিম সাহেবের মতো মানুষ দরকার। পরের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করতে পিছ পা হন না। এই প্রসঙ্গে তিনি রবি ঠাকুরের একটি কবিতার চরণও আবেগজড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন– "কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি।[১]

'মন্ত্রীর হেলিকপ্টার' ও 'ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য' গল্প দুটি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে সমুজ্জ্বল। গল্প দুটিতে প্রহসনের উতরোল হাসি থাকলেও জীবনাভূতির গভীরতায় লুকিয়ে আছে গভীর ক্রন্দন।

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের পরিচিত একটি ভৌগোলিক পরিসীমা আছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিসর এবং ঢাকা শহর– এই দুটি ভৌগোলিক সীমায় হুমায়ূন আহমেদের প্রায় গল্পগুলোই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিগুলোর পট পরিসর অন্য ভুবনের। তবে এসব গল্পের মানুষেরাও বিচরণ করে গ্রাম বাংলা কিংবা ঢাকার এলাকাজুড়েই। 'বুড়ি' এবং 'লিপি' গল্পদ্বয় অবশ্য আমেরিকার ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত। তিনি নেত্রকোণার মানুষ। ফলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল তাঁর কথাসাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গ্রামজীবনের প্রতি ছিল তার প্রবল আন্তরিকতা।

হুমায়ূন আহমেদ গ্রামীণ পট-পরিসরে যেসব গল্প বর্ণনা করেছেন সেসবের বেশির ভাগই ময়মনসিংহ-নেত্রকোণা অঞ্চলের। ভাষা ব্যবহারেও তিনি এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে কিছু শব্দ তিনি স্বেচ্ছায় পরিবর্তিত করেছেন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর জন্মভূমি নেত্রকোণার বিভিন্ন এলাকা গল্পে তুলে এনেছেন। দেশের বাইরেও তাঁর গল্পের চরিত্রেরা গিয়েছে তবে ফিরে এসেছে ঢাকায় কিংবা নেত্রকোণার কোনো নিভৃত অঞ্চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এর আশেপাশের এলাকা, পুরানা পল্টন, নিউমার্কেট, পল্লবী-প্রভৃতি এলাকা তাঁর গল্পে নগরজীবন বর্ণনায় ওঠে এসেছে।

নবীনগর, সোনাপোতা, নীলগঞ্জ, কেন্দুয়া, ধুন্দুলনাড়া, নান্দাইল, নিয়ামতপুর– প্রভৃতি এলাকা ওঠে এসেছে গ্রামীণ পট-পরিসরে লেখা গল্পসমূহে। উল্লিখিত গ্রামগুলো ময়মনসিংহ-নেত্রকোণার অভ্যন্তরেই। তবে হুমায়ূন আহমেদ দু-একটি গ্রামের নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছেন বলেই জানা যায়। ঢাকা শহর এবং বাংলাদেশের গ্রামকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশক থেকে এ পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিকই গল্প রচনা করেছেন। তবে হুমায়ূন আহমেদের মতো এমন আঞ্চলিকতাপ্রীতি বাংলা ছোটগল্পে অন্য কোনো গল্পকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪৫৫

হুমায়ূন আহমেদ অনেকগুলো গল্পে একই নাম বারবার নিয়ে এসেছেন। কেন এমন হয় – এ প্রশ্নের জবাবে হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন যে তিনি নাকি নাম খুঁজে পান না। তবে এটি তাঁর খেয়ালি উত্তর। কারণ, হুমায়ূনের নির্বাচিত নামগুলোর একটি সার্কেল আছে। যখন তিনি প্রেমের গল্প লিখছেন তখন এসেছে রূপা, মীরা, জরী, আনিস, মঞ্জু প্রমুখেরা। নিম্নবর্গের কোনো গল্পে এদের পাওয়া যায় না। এ পর্যায়ে এসেছে ইউনুস, মতি নামের মানুষেরা। হুমায়ূন আহমেদের একাধিক কাহিনিতে একই চরিত্র স্থাপনের এই প্রবণতার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ড. আনিসুজ্জামান –

> একাধিক কাহিনিতে একই চরিত্র স্থাপন করে সে শুধু ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করে নি, পাঠকদের সঙ্গে তাদের এক ধরনের আত্মীয়তা তৈরি করেছে।[১]

হুমায়ূন আহমেদ নেতিবাচক চরিত্রকেও দরদ দিয়ে উপস্থাপন করেন। 'অয়োময়' গল্পের বদরুল আলম সাহেব, 'কৃষ্ণপক্ষ' গল্পের হানিফ, 'আলাউদ্দিনের ফাঁসি' গল্পের আলাউদ্দিন, 'পঙ্গু হামিদ' গল্পের হামিদ, 'পাথর' গল্পের চিত্রার মা এরা সবাই নেতিবাচক চরিত্রের। কিন্তু অন্তিমে এদের কেউ কেউ লাভ করেছে পাঠকের অপরিসীম মমতা। যেমন – 'অয়োময়' গল্পের বদরুল আলম সাহেব প্রথম দিকে ইউনুসকে সহ্য করতে না পারলেও পরে তিনিই জীবন বাঁচাতে তাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। বদরুল আলম ও ইউনুসের মাঝে তৈরি হলো মানবতার সেতু। দুই প্রান্তের মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে দিলেন হুমায়ূন আহমেদ।

মধ্যবিত্তের জীবন বর্ণনায় হুমায়ূন আহমেদ কোনো ভণিতার আশ্রয় নেননি। সরল বর্ণনায় তিনি উন্মোচন করেছেন মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-সাধ। সত্তর দশকের গল্পকারদের কেউ কেউ 'যুদ্ধোত্তর হতাশা ও গ্লানিমিশ্রিত শব্দমৈথুনে' নির্মাণ করেছেন নৈরাশ্যের অতলে নিমজ্জিত জীবনগাথা। তবে হুমায়ূন তা করেননি। তিনি জীবনকে দেখেছেন ইতিবাচক দৃষ্টিকোণে। একটি বড় মাছ নিম্নমধ্যবিত্তের সংসারে কতটা আনন্দ-আবহ তৈরি করে হুমায়ূন তাও দেখিয়েছেন। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের প্রতিদিনের জীবনযাপনে সাধারণ বিষয়ের ওপর আলো ফেলে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন অসাধারণ বোধকে। হুমায়ূন পাঠককে ভাবতে শিখিয়েছিলেন। কীভাবে বোধকে বিকশিত করত হবে তা শিখিয়েছিলেন। তাই তাঁর গল্পে বাস্তবতার সাথে মিশে আছে কল্পনার জগৎ। হুমায়ূন আহমেদের একটি গল্পে কোনো এক চরিত্রের দৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত সম্পর্কে বলা হচ্ছে –

> মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাজিল অংশ। আনকন্ট্রোলড গ্রোথ।এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের কাছে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম মদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায়।[২]

চরিত্রের দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশের নাগরিক মধ্যবিত্তের এই মূল্যায়ন হয়তো সঠিক কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ এই দিকে হাঁটেননি। তিনি জীবনের নির্মল ও শুদ্ধবোধগুলোকে তুলে আনতে চেয়েছেন। তিনি মধ্যবিত্তের যে জীবন-বাস্তবতা তুলে এনেছেন তাতে জীবনের সরল অংশগুলোই ওঠে এসেছে।

[১] ড. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত হুমায়ূন আহমেদ স্মারক গ্রন্থ, ২০১২, মুখবন্ধ

[২]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা- ৩৬২।

অনেক সাহিত্যিকের মতো যৌন সম্পর্কের রগরগে বর্ণনা তাঁর গল্পে নেই। সেক্স-ভায়োলেন্সের কোনো উপাদান হুমায়ূন আহমেদ গল্পে আনেননি। যৌন সম্পর্কের ফেনিল উপস্থাপনায় সত্তর-আশির দশকে অনেক গল্পকাররাই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছেন। বলা হয়ে থাকে হুমায়ূন আহমেদের পাঠকরা 'টিনেজার'। তবু টিনেজারদের মন যোগাতে হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়তা অর্জনের এ পথে হাঁটেননি, যে পথ তরল-পিচ্ছিল।

হুমায়ূন আহমেদ আধ্যাত্মিকতা, দুর্জ্ঞেয়তায় আস্থাবান ছিলেন। ফলে তাঁর গল্পের আখ্যানে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রায়ই অনুপস্থিত। তাঁর গল্পের উপসংহার হয় রহস্যঘন। হুমায়ূন আহমেদ রচিত অতিপ্রাকৃত গল্পগুলো এ বক্তব্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোর পর বাংলা ছোটগল্পে এ ধরনের গল্প লিখে সফলতা অর্জন করেছেন খুব কম সংখ্যক কথাসাহিত্যিক। বাংলাদেশের ছোটগল্পে এ ধারার লেখক সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে হুমায়ূন আহমেদের অতিপ্রাকৃত গল্পের জগৎ দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় হলেও তা দুর্বোধ্য বিকৃত নয়। গল্পগুলোর অন্তিমে জগতের অমীমাংসিত রহস্য থাকলেও জীবনের প্রতি ইতিবাচকতা ও মর্ত্যপ্রেমের বিষয়গুলোই ক্রিয়াশীল থাকে।

হুমায়ূন আহমেদ নগরজীবনকে বর্ণনা করেছেন নিরাসক্তভাবে। নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের বর্ণনায় হুমায়ূনের কোনো ধরনের ইতস্ততা নেই। জীবন যেখানে যেমন তিনি তেমনই বলে যান–

> সহায় সম্বলহীন একটি ছেলের কাছে এ শহর যে কী পরিমাণ হৃদয়হীন হতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। নিষ্ঠুর এবং অকরুণ এই শহরে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সে সময় সারাক্ষণই খিদের কষ্ট লেগে থাকত। ফুটপাতের পাশে চটের পর্দার আড়ালে ভাতের দোকান গুলি দেখলেই মন খারাপ হয়ে যেত। দেখতাম রিকশাওয়ালা শ্রেণির লোকেরা উচু হয়ে বসে গ্রাস পাকিয়ে মহানন্দে ভাত খাচ্ছে। চুম্বকের মতো সেই দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করত।[১]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে সমাজের যথার্থ প্রতিফলন নেই-এমন অভিযোগ করেন কেউ কেউ। তিনি গল্প লেখেন মানুষের মনোজগতের স্বরূপ-সন্ধানী হয়ে। ফলে তাঁর গল্পজুড়ে সমাজচিত্র থাকে না বটে কিন্তু তিনি তো মানুষকে নিয়েই গল্প লেখেন। আর তাঁর গল্পের মানুষেরা তো সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। পক্ষান্তরে তিনি সমাজের চিত্রও তুলে ধরেন। তবে তা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। কয়েকটি গল্পে সমাজবাস্তবতার চিত্র সরাসরি পাওয়া যায় –

> ক. বশির মোল্লা অলস চোখে খবরের কাগজের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিতে এরশাদ সাহেবকে একজন বৃদ্ধের কাঁধে হাত রেখে কি যেন বলতে দেখা যাচ্ছে। গুচ্ছগ্রাম-ট্রাম হবে। একেক প্রেসিডেন্ট এসে একেকটা কায়দা করেন। জিয়া সাহেব খাল কাটিয়ে গেছেন। ইনি বানাচ্ছেন গুচ্ছগ্রাম। পরের জন এসে কী করবে কে জানে ।[২]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা- ১৯০।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৭৮।

খ. থানা থেকে পুলিশ সাহেব এসে চারদিকে মিথ্যা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। একে ধমকায় তাকে ধমকায়-এই গুলি দেখতে ভালো লাগে। পুলিশ সাহেব মুখে দুঃখ এবং রাগ রাগ ভাব ফুটাতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। পুলিশ সাহেবের মুখ দেখেই মনে হয় তিনি গভীর আনন্দ বোধ করছেন। খুন-খারাপি মানেই তাঁদের পকেটে কিছু কাঁচা পয়সা।[১]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে বাৎসল্যপ্রীতির অনন্য স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর বাবা চরিত্রগুলি নির্মাণশৈলীতে অসাধারণ । প্রান্তিক-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেই বাৎসল্যপ্রীতির বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। অনেক গল্পেই সুন্দর একটি পারিবারিক আবহের চিত্র লক্ষ করা যায়। সংসারে অভাব আছে তবে স্নেহ-মায়া-মমতার কমতি নেই। চলমান জীবনের স্বচ্ছন্দগতি হুমায়ূনের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'কবি' 'আনন্দ-বেদনার কাব্য', 'নিশিকাব্য', 'অসময়' প্রভৃতি গল্পে বাৎসল্যপ্রীতি ও চলমান জীবনের চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। হুমায়ূন আহমেদের গল্পে পট-পরিসরের বিস্তৃতি নেই, তবে সাধারণকে অসাধারণ করে দেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

হুমায়ূনের গল্প রচনায় বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল আছে। তাঁর প্রচুর জানাশোনার বিষয়টি গল্পে ধরা পড়ে। পাঠক খুব সহজেই হুমায়ূনের গল্প পড়ে শিক্ষণীয় কিছু জানতে পারে। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিগুলোয় এ বিষয়টির উপস্থিতি বেশি। বাংলাদেশে প্রথম সায়েন্স ফিকশনকে তিনি একক প্রচেষ্টায় জনপ্রিয় করে তুলেছেন। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লিখলেও গল্পের অন্তিমে মানুষের অসঙ্গতি, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্যই ধ্বনিত হয়েছে। 'যন্ত্র' গল্পটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
হুমায়ূন আহমেদের প্রকৃতিচেতনা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। তিনি প্রকৃতিকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন বাংলাদেশের ছোটগল্পে সেভাবে আর কেউ করেননি। বাংলার জল- জোছনা নিয়ে হুমায়ূনের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতির নির্জনতা, জল- জোছনার চমৎকার আবহ কাব্যিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন –

ক. বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেঘ কেটে অপরূপ জ্যোৎস্না উঠেছে। বৃষ্টি-ভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জ্যোৎস্না।[২]

খ. জানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়েছে। চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে।[৩]

হুমায়ূন আহমেদ প্রকৃতিকে একেছেন মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে। প্রকৃতির বিরূপ আচরণ এসেছে জীবনের ক্রান্তিলগ্নে, আর জীবনের আনন্দযোগে প্রকৃতি এসেছে অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা- ৩৩৮।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৩০।

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২২।

হুমায়ূন আহমেদের ছিল সহজাত রসবোধ। কৌতুকাবহ কাহিনি রূপায়ণে তিনি সিদ্ধহস্ত। চরিত্রে হিউমার সৃষ্টি করে কাহিনিকে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে নেন তিনি। যেমন–

ক. সময়-অসময় নেই স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে মাথায় একটা কাঁঠাল নিয়ে লোকজন আসতে থাকবে আর আমি গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরব?[১]

খ. পার্টির মধ্যমনি হয়ে লাল মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বুড়ি এর তার কাছে যায়। উজ্জ্বল চোখে বলে,
–'জীবন বড় আনন্দময়, কি বল?
আমরা বিরস মুখে বলি, 'হ্যাঁ।'
– বড় সুন্দর পার্টি হলো 'অসাধারণ।'
হ্যাঁ, 'অসাধারণ।'
– আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার ইয়ুথে ফিরে গেছি।
খুবই ভালো কথা ফিরে যাও।[২]

হুমায়ূন আহমেদের নর-নারীর প্রণয় সম্পর্কের গল্পগুলোর আছে এক ধরনের শুভ্রতা। নর-নারীর নিষ্কলঙ্ক সম্পর্কের জীবনমুখী গল্প রচনা করেছেন তিনি।

হুমায়ূন আহমেদের দেশপ্রেম ছিল প্রবল। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। ফলে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্পগুলো হয়ে উঠেছে আলাদা। সত্তর-আশির দশকে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প লিখলেন তাঁদের সকলের গল্পের বিষয় এক, আঙ্গিক অভিন্ন। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পে সমরচিত্র তুলে ধরেননি। তিনি মানবমনের গহীনে অনুসন্ধান করেছেন। তুলে এনেছেন একগুচ্ছ এপিগ্রাম যা আমাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নতুন ভাবনার খোরাক যোগায়। যেমন – 'অসুখ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব মাতৃত্বের বোধের কাছে। খোকন নামের এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে মাঠের মধ্যে জবাই করে মেরে ফেলেছে।

খোকনের মা ছেলের মৃত্যুর এই প্রক্রিয়াটি মেনে নিতে পারেননি। মানবসভ্যতার এই বর্বরতাটি তাঁকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত, অপ্রকৃতিস্থ। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে যিনি মিথ্যা করে বলবেন যে, 'না, হত্যাকাণ্ডটি ওরকম বীভৎস ছিলনা'। তারপর তিনি কিছুদিন সুস্থ থাকেন।

'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পে দেখা যায়, একজন বাবা, যিনি তার সন্তানদের যুদ্ধে হারিয়েছেন, তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন সন্তানের ক্ষতিপূরণ চেয়ে নয়। তিনি চান যুদ্ধাপরাধের বিচার হোক। আর এজন্য জনমত সংগ্রহ করেন জলিল সাহেব। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন গল্প হুমায়ূন আহমেদের পূর্বে কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা- ১৫২।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৮।

হুমায়ূন আহমেদ অন্বেষণ করেছেন মানুষের ইতিবাচকতা। মানবিক দৃষ্টিকোণে হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করেছেন তাঁর গল্পের আখ্যান। হুমায়ূন জীবন ও জগতকে দেখেছেন এক মায়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে। জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ ও নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা ও তাঁর এই মায়াবী দৃষ্টির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে অসামান্য হৃদয়গ্রাহী। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, অতিপ্রাকৃতের মতো গল্পগুলোতেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই ওঠে এসেছে।

হুমায়ূন আহমেদ গল্পকে তত্ত্বভারাক্রান্ত করেননি। সহজ ও সরল ভাষায় তিনি গল্প বলে গেছেন। গল্পবলায় সংলাপরীতির ব্যবহার, ভাষার গতিময়তা, ঘটনার আকস্মিকতা, প্রকৃতির কাব্যিক বর্ণনা, দৃষ্টিকোণ, রসবোধ তাঁর গল্পের শৈল্পিক প্রকরণকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ শৈলী সম্পর্কে বিদগ্ধজনের মন্তব্য এরূপ–

ক. তার গল্পের মুগ্ধতা, কাহিনি বিন্যাস, নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে একইসঙ্গে সব বয়েসী পাঠকের কাছে একটা আশ্চর্যরকম গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তার লেখার স্নিগ্ধতা, ভাষার গতিশীলতা, সারল্য পাঠকের কাছে ছিল দারুণ আকর্ষণীয়।[১]

খ. হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন তাঁর ছোটগল্পের জন্য। তার কিছু ছোটগল্প কেবল বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতেও অসাধারণ, জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন অনবদ্যভাবে।[২]

গ. ... তার গল্পের প্রকরণ জটিলতা বর্জিত। কিন্তু সরল প্রকরণে বর্ণিত তার গল্পগুলোতে জীবন কখনোই লঘু বা তরল নয়; বরং সে জীবন বহুমাত্রায় উন্নীত, এক ব্যঞ্জণাময় গভীর জীবনসত্যের ইঙ্গিতবাহী, ছোটগল্পকার হিসেবে এখানেই তার বিশেষত্ব।[৩]

হুমায়ূন আহমেদ সত্তরের দশক থেকে শুরু করে গত চল্লিশটি বছর ধরে বলে গেছেন বাংলা ও বাঙালির কথা। প্রবল দেশপ্রেম নিয়ে, জীবনকে দেখার এক নির্মোহ এবং সরল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নির্মাণ করেছেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একগুচ্ছ জীবনবাদী ছোটগল্প। অতি সাধারণের কথা অসাধারণত্বের মহিমা দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন মানবিক সৌধ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের মূল প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করা যায়। হুমায়ূনের গল্পে প্রায়ই উৎকেন্দ্রিক মানুষ আখ্যানের কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। তিনি আধ্যাত্মিকতা ও দুর্জ্ঞেয়তায় আস্থাবান ছিলেন বলে আখ্যানে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুপস্থিত। তাঁর গল্পের উপসংহার রহস্যঘন। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে আবিষ্কার করেছেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পগুলো মানবিকতায় ঋদ্ধ।

[১]. তিনি আমাদের, সেলিনা হোসেন, দৈনিক সমকাল, ২১ জুলাই ২০১২

[২]. হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা, সৈয়দ শামসুল হক, দৈনিক সমকাল, ২১ জুলাই, ২০১২

[৩]. চঞ্চল কুমার বোস, বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, ২০০৯, বাংলা একাডেমি।

নেতিবাচক চরিত্রকে দরদ দিয়ে উপস্থাপন করেন হুমায়ূন আহমেদ। মধ্যবিত্তজীবনের সরল উপস্থাপনা আছে তাঁর গল্পে। প্রান্তিক মানুষের প্রতি আছে দরদ। নগরজীবনকে তিনি বর্ণনা করেছেন নিরাসক্তভাবে। তাঁর গল্পে নর-নারীর সম্পর্কে আছে শুচিতা-শূভ্রতা-নিষ্কলঙ্ক। হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয় লেখক তবে যৌনপ্রিয় নন। তাঁর গল্পগুলো একথার স্বাক্ষর বহন করে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ বর্ণনার চেয়ে হুমায়ূন গুরুত্ব দেন চরিত্রের মনোজগতের রহস্যলোকে। বাৎসল্যপ্রীতির স্নিগ্ধতা তাঁর গল্পের অন্যতম উপজীব্য। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোয় বিকারগ্রস্ত মানুষ নেই। তাঁর গল্পের জগৎ রহস্যময় হলেও অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। তাঁর গল্পের ভাষা অনাড়ম্বর, প্রকরণ জটিলতা বর্জিত, ভাষা স্বচ্ছন্দ গতির, ঘটনার বাঁক নাটকীয়, এবং নির্মল রসবোধসম্পন্ন। সত্তরের দশকের অধিকাংশ ছোটগাল্পিক যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শব্দচিত্র অঙ্কনেই ছিলেন অধিক আগ্রহী। দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথাচিত্র নির্মাণে তারা একান্তই অনাগ্রহী। দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদের পরিবর্তে অনেকেই নির্মাণ করলেন জীবনের নেতিবাচকতা।

কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের বিষয় ও প্রকরণশৈলী আলোচনা করে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, নির্বেদ নিরানন্দের অতল গহ্বরে হুমায়ূনের গল্পের চরিত্রেরা হারিয়ে যায়নি। যুদ্ধোত্তর হতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাশ্যের শব্দরূপের বিপরীতে হুমায়ূন নির্মাণ করেছেন আশাবাদী, প্রাগ্রসর আর ইতিবাচক জীবনের শব্দরূপ। এখানেই অন্যদের চেয়ে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের স্বাতন্ত্র্য। হুমায়ূনের সাহিত্য নিয়ে অনেক সমালোচকই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যেমন–

ক. গত ৫০ বছরে যে কয়জন লেখক বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে সে তালিকার অনেক উপরে স্থান করে নিয়েছে হুমায়ূন । ...
তার মধ্যে অনেক রস-জ্ঞান যেমন আছে, তেমনি অনেক বিষয়ে তার গভীর পড়াশোনার বিষয়টি ধরা পড়ে। সবচেয়ে বড়কথা মানুষ হিসেবে সে ছিল হাসি-খুশি ও আড্ডাপ্রিয়। ...
তার জনপ্রিয়তা এতই ছিল যে, দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় টানা ৮ বছর তার উপন্যাস ছাপা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কোনো লেখকের ভাগ্যে এই ভালোবাসা জোটেনি।[১]

খ. হুমায়ূন আহমেদ একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতো কথক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা সাহিত্যে বেশি দেখা যায়নি। এদিক দিয়ে তিনি একজন প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। কিন্তু নিজের এই প্রতিভাকে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির কাজে যেভাবে ব্যবহার করার কথা হুমায়ূন তা করেননি বা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। হুমায়ূন তাঁর জীবদ্দশায় একজন কথা সাহিত্যিক হিসেবে প্রবল প্রতাপ অর্জন করলেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে টেকসই হবে মনে করার কারণ নেই। টেকসই হওয়ার চেষ্টা তিনি নিজেও করেননি। একজন প্রতিভাবান লেখকের জীবনে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কী হতে পারে।[২]

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মফিজ উদ্দিন মিলন সম্পাদিত, হুমায়ূন আহমেদ স্মারক গ্রন্থ, ২০১৩ পৃষ্ঠা-১১-১২

২. বদরউদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৪

গ. হুমায়ূন আমাদের লেখক, আমাদের কথাশিল্পী, আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ এক নিপুণ রূপকার। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি অনেক প্রতিশ্রুতিশীল মুখ উপহার দিয়েছেন এবং সে কারণেই তিনি এত বেশি জনপ্রিয়। হুমায়ূন আহমেদ মানুষকে বিশ্বাস করতেন, পাঠককে সম্মান করতেন, কোনো মোড়লীকে গ্রাহ্য করতেন না।[১]

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য টিকবে কী টিকবে না সেটা আসলে সময়ই বলে দেবে। বাংলাভাষার পাঠকদের কাছেই এ বিবেচনার বিষয়টি অর্পিত থাকুক। হুমায়ূন আহমেদ নিজে অবশ্য কখনো এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মতো্ 'হে প্রিয় আমি যতদিন আছি। তুমিও থাকিও' – এমনটিই ছিল তাঁর মনোভাব।

তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পরিক্রমায় বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের কথকতা জানতে, যুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দী সময় ও জীবনকে জানতে পাঠক নিশ্চয়ই হুমায়ূন সাহিত্যের দ্বারস্থ হবেন – এমনটা বলায় বাহুল্য মনে করার কারণ নেই। সমকাল তাঁর প্রতি যে প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছে সে আগ্রহ মহাকালেও অক্ষুণ্ন থাকবে; এমন আশা সম্ভবত দুরাশা নয়।

[১]. ভূমিকাংশ, মফিজ উদ্দিন মিলন সম্পাদিত, হুমায়ূন আহমেদ স্মারক গ্রন্থ, ২০১৩;

তৃতীয় অধ্যায়

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প

তৃতীয় অধ্যায়
হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের অবস্থান অত্যন্ত সংহত। বাংলাদেশের মানুষের বিচিত্র জীবনধারা তিনি তাঁর ছোটগল্পে উপজীব্য করেছেন। তিনি জীবন ও জগতকে দেখেছেন এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের যথার্থ রূপকার তিনি। আমাদের জীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন চিত্তাকর্ষক জীবনানুষঙ্গ। ফলে পাঠক মাত্রই তাঁর গল্প পড়ে মোহিত না হয়ে পারেন না। হুমায়ূন আহমেদ শোয়া শ'র মত ছোটগল্প লিখেছেন। 'আমার আপন আঁধার (১৯৯৩), 'এই আমি' ও হোটেল গ্রেভার ইন' (১৯৮৯) হুমায়ূন রচিত স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ হলেও লেখনী কৌশলে কয়েকটি রচনা ছোটগল্পের মহিমা লাভ করেছে। ফলে সেখান থেকে কয়েকটি গল্প আলোচনা করা হলো। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম, প্রকাশকাল গ্রন্থে উল্লিখিত গল্পসমূহের নাম– 'নিশিকাব্য (১৯৮৪) [নিশিকাব্য, শ্যামল ছায়া, কল্যাণীয়াসু, একজন ক্রীতদাস, নন্দিনী, শঙ্খমালা, ফেরা, সৌরভ, ভালবাসার গল্প, অসময়, বান]; 'আনন্দ বেদনার কাব্য' (১৯৮৫) [আনন্দ বেদনার কাব্য, এইসব দিনরাত্রি, উনিশ শ একাত্তর, জলছবি, খেলা, শিকার, পাখির পালক, অসুখ, কবি]; 'শীত ও অন্যান্য গল্প' (১৯৮৮) [অতিথি, সাদা গাড়ি, গোপন-কথা, একজন সুখী মানুষ, জলিল সাহেবের পিটিশন, যন্ত্র, শীত, সুখ-অসুখ, রহস্য, অপরাহ্ন, রূপা]; 'অয়োময়' (১৯৯০) [অয়োময়, খাদক, অচিন বৃক্ষ, পিঁপড়া, অপেক্ষা, কৃষ্ণপক্ষ, অংক শ্লোক]; 'ভয়' (১৯৯৯) [চোখ, জিন-কফিল, সঙ্গিনী]; 'জলকন্যা' (১৯৯৬) [জলকন্যা, পাপ, সংসার ব্যাধি, জনক, চোর, শৃংখলা, কবর, লাবাম্বা, একজন শৌখিনদার মানুষ, আঙুল, ছুনু মিয়া, চোখ]; 'ছায়াসঙ্গী' (২০০৯) [ছায়াসঙ্গী, শবযাত্রা, ওইজা বোর্ড, সে, দ্বিতীয়জন, বীনার অসুখ, কুকুর, ভয়] 'আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ'(২০০৯) [মিস মনোয়ারা, কাকারু, পঙ্গু হামিদ, ফোর্টি নাইন, সগিরন বুয়া, নয়া রিকশা, আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ, আনোভা, তিনি, আলাউদ্দিনের ফাঁসি, ভালোবাসা, টিকটিকি, ভূত]। হুমায়ূন আহমেদের গল্পসমগ্র প্রকাশিত হয় কাকলী প্রকাশনী থেকে, পুনঃসংযোজিত ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ২০১৫ সালের এপ্রিলে।

আলোচনার সুবিধার্থে গল্পের প্রবণতাসূত্র চিহ্নিত করে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদসমূহে বিন্যস্ত করা হয়েছে–

প্রথম পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নিম্নবিত্তজীবন
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্ক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হুমায়ূন আহমেদের অতিপ্রাকৃত ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক ছোটগল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ
হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক পবিত্রতম অধ্যায় এবং অস্তিত্বের অহংকার। একাত্তর পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিষয়রূপে মুক্তিযুদ্ধের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। সত্তর দশকের অধিকাংশ গল্পকারের 'গল্পের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বলিত কথাবস্তু।'[১] বাংলা ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের অবস্থান সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত:

ক. মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প রচিত হলেও আমরা এখনো পাইনি এমন একগুচ্ছ কালজয়ী গল্প যা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির সম্মিলিত চৈতন্যের জাগরণকে যথাযথভাবে প্রতিমায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার সোনালি প্রভায় আমাদের মন আর মননে যে চেতনা জাগ্রত হয়েছে, ছোটগল্পে তার প্রতিফলন ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। ....দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদে উচ্চকিত হবার পরিবর্তে অনেকেই যেতে চাইলেন নির্বেদ-নিরানন্দের অতল গহ্বরে; এবং সবাই মিলে সম্মিলিত-সাধনায় লিখলেন মাত্র একটি ছোটগল্প, যার মৌল বিষয় নাস্তি-নিখিল নাস্তি।[২]

খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ শুধুমাত্র (শুধু) পাকিস্তানি সেনাদের বাঙালি নিধন ও অত্যাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুক্তিযুদ্ধ এদেশের প্রায় সকল মানুষকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে গেছে। এ কারণে এর বিভিন্নমুখী প্রকাশ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।[৩]

বাংলা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদের পদচারণা মূলত সত্তর দশকেই। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো আলোচনা করলে অন্যান্য গল্পকারদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা সহজ হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। অত্যন্ত কাছ থেকে তিনি দেখেছিলেন যুদ্ধ-বাস্তবতা। 'এক অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস হয়ে মুক্তিযুদ্ধ হুমায়ূনকে আলোড়িত করেছে বারংবার। মুক্তিযুদ্ধ অধিকার করে আছে তাঁর মন ও মননের অনেকখানি অংশ। অতলান্ত অনুভব দিয়ে স্পর্শ করতে চান মুক্তিযুদ্ধের আবেগ, প্রত্যয় ও প্রেরণাকে।'[৪] মুক্তিযুদ্ধকালে পিতার নির্মম মৃত্যুতে হুমায়ূন আহমেদের হৃদয় আন্দোলিত হয়েছিল। যুদ্ধে যাওয়ার মতো সাহস তাঁর ছিল না ঠিকই তবে তিনি মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন কল্পনায়, আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'শ্যামল ছায়া'তে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য পত্র রয়েছে সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর আবেগ-ক্ষোভ-যন্ত্রণা –

> আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। উনিশ শ একাত্তর সালের পাঁচই মে তাঁকে দেশপ্রেমের অপরাধে পাক আর্মি গুলি করে হত্যা করে। সে সময় আমি আমার ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বরিশালের এক গ্রামে লুকিয়ে আছি। কী দুঃসহ দিনই না গিয়েছে। বুকের ভিতর কিলবিল করছে ঘৃণা লকলক করছে প্রতিশোধের আগুন.....।

[১]. সুশান্ত মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দ্বৈরথ সময়, আজকের কাগজ, ঢাকা, ১৫.০৮.১৯৯১

[২]. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, বাএ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৯৩-১৯৪

[৩]. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ, বাএ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২১৫

[৪]. সরদার আবদুস সাত্তার, হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা, ডিসেম্বর, ১৯৯২

ফলে হুমায়ূন আহমেদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের মূল্য অনেক। তাঁর কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধকে নান্দনিক শিল্পশৈলীতে গভীর মমতারসে সিঞ্চিত করেছেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগুলোকে দুই ভাগে বিন্যস্ত করা যায়–

১. যুদ্ধকালীন বাস্তবতা ও পটপরিসর;
২. যুদ্ধোত্তর কালের বাঙালি জীবনাচরণে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া।

যুদ্ধকালীন বাস্তবতার চিত্র আছে 'উনিশ শ একাত্তর', 'পাপ', এবং 'হোটেল আহমেদিয়া' এই তিনটি গল্পে।

যুদ্ধকালীন গ্রামীণ বাস্তবতা উঠে এসেছে 'উনিশ শ একাত্তর' গল্পে। পাকিস্তানি মিলিটারির ধ্বংসলীলার প্রচলিত চিত্রের বাইরে ভিন্নধর্মী ছোটগল্প এটি । জ্বালাও-পোড়াও, গুলি-বারুদের গন্ধহীন, সম্মুখ-সমরের চিত্রহীন অনন্য এ গল্পে পাক আর্মির নোংরা হাসি-তামাশা ও বাঙালির প্রতি তাদের অমানবিক আচরণ পাঠকের মনকে আলোড়িত করে প্রবল ঘৃণায় এবং হৃদয়কে আন্দোলিত করে দেশপ্রেমের বিগলিত রস-রসায়নে।

বাংলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে সন্ধার আগেই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মিলিটারির দলটি প্রবেশ করে। গ্রামের সকলে লুকিয়ে পড়লেও কেবল বদি পাগলা হাসিমুখে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে বেঁধে ফেলা হল আমগাছের সাথে। এতে বদি পাগলাকে আনন্দিতই মনে হল– মিলিটারির কাছাকাছি থাকার আনন্দ।
এ গল্পে রফিক নামে এক রাজাকারের উপস্থিতি রয়েছে। গ্রামের পরিবেশ-প্রতিবেশ সম্পর্কে সে-ই মেজর সাহেবকে সব বলে দিচ্ছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আজিজ মাস্টার। সে অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির। সোনাপোতা গ্রাম থেকে তার সন্তানসম্ভবা ছোটবোন এসেছে। বোনের এমন বিপদের কারণেই সে পালাতে পারেনি। প্রসব বেদনায় কাতর বোনকে নিয়ে গঞ্জে যেতেও ভয় তার। তার এই চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে তার মা তাকে কুৎসিত একটি গালি দিয়েছেন–

> পা ভাঙা বিড়ালের সাথে তুলনা করেছেন। আজিজ মাস্টার প্রতিবাদ করেনি। কারণ কথাটি সত্যি। সে বড়ই ভীতু। গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে শোনার পর থেকে তার ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে।[১]

কিন্তু আজিজ মাস্টার শিক্ষিত। মিলিটারির ভাষা তিনি বুঝবেন। তাই গ্রামের অনেকেই অনুরোধ করল বদি পাগলাকে উদ্ধারের জন্য। একজন পাগলের প্রতিও গ্রামের মানুষের যে স্নেহ-মমতা তা যেন গ্রামবাংলার সামবায়িক জীবনযাপনকেই ইঙ্গিত করে। নিতান্ত অনিচ্ছায় ভয়ে ভয়ে আজিজ মাস্টার 'অসম্ভব সুপুরুষ' মেজর সাহেবের সামনে দাঁড়াল। মেজর সাহেব 'পরিষ্কার বাংলা'য় কথা বলা শুরু করলেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৭

তাঁর কথাবার্তায় নির্লজ্জ মেজরের বীভৎস মানসিকতা হয়ে ওঠে স্পষ্ট –

– কী কথা বলছ না যে! তোমার স্ত্রীও কি জঙ্গলে লুকিয়েছে?

– স্যার আমি বিয়ে করিনি।

– বিয়ে কর নি? বয়স কত তোমার?

– চল্লিশ।

– চল্লিশ! এখনো বিয়ে করনি? তাহলে চালাও কীভাবে? মাস্টারবেট কর?[১]

এরপর মেজর সাহেব আরেকটি ভয়ঙ্কর রসিকতা করে। সে আজিজ মাস্টারকে পায়জামা খুলে 'যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কী না' সকলকে দেখাতে বলল। কেউ একজন টান দিয়ে তার পায়জামা খুলে ফেলল। হতভম্ব আজিজ মাস্টার দুহাত দিয়ে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করল। চারদিকে মৃদু হাসির গুঞ্জন। এই অমানবিক, নোংরা রসিকতা পাকিস্তানি মিলিটারির বিকারগ্রস্ত মানসিকতাকে চিহ্নিত করে। এই নির্মম কৌতুক কারো মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কেবল বদি পাগলা তাকে বলল– 'ও মাস্টার কাপড় পিন্দ। তুমি ন্যাংটা।'[২]

নির্মম রসিকতার পরও আজিজ মাস্টারের কাছে মেজর জানতে চায় সে পাকিস্তানকে ভালোবাসে কিনা। প্রথমে সে মিথ্যা বললেও 'মাথার পেছনের দিকটায় তীব্র তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা'[৩] নিয়ে আজিজ মাস্টার এবার সত্য কথাটি বলে দেয় – পাকিস্তানিদের সে প্রবলভাবে ঘৃণা করে।

মেজর সাহেব কাপড় পরে 'ক্লিয়ার আউট' হতে বললে আজিজ মাস্টার কাপড় পরেনি। তাঁর তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে মেজরের শার্টে একদলা থু থু ফেলে। আজিজ মাস্টারের থু থু ঘৃণার কার্তুজ হয়ে আছড়ে পড়ে মেজরের শরীরে। মেজর আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। মিলিটারির দলটি গ্রাম ত্যাগ করে মার্চ করতে করতে। একজন ভিতু প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক চকিতে যে সাহস অর্জন করেছে তাই নিয়ে 'পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে' নগ্ন অবস্থায়।

এ গল্পটি পাকিস্তানি মিলিটারির অমানবিক নির্যাতনের চিত্রটি যেমন প্রকাশ করে তেমনি এ-প্রতীতীও বিজ্ঞাপিত করে যে, সময়ের প্রয়োজনে একজন ভিতু মানুষও অসম্ভব সাহসী হয়ে উঠতে পারে। আজিজ মাস্টারের আচরণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিদের প্রতি চরম ঘৃণার প্রকাশ – এ গল্পের মূল উপজীব্য। 'পাপ' স্বল্প পরিসরের অতলস্পর্শী গভীরতার একটি ছোটগল্প। যুদ্ধের পটভূমি ব্যতীত এমন গল্প কখনোই সৃষ্টি হতে পারে না। গল্পের ঘটনা যুদ্ধের সময়ের। এক স্কুল শিক্ষকের জবানিতে যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গল্পটি বিবৃত হয়েছে। পাপ-পুণ্যের স্বরূপ নিয়ে লেখকের অনাবিল আগ্রহের অসাধারণ ছোটগল্প 'পাপ'।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪০

[২]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১

গল্পের ঘটনাসংক্ষেপ এরকম –

মাধবখালি ইউনিয়নের ধলা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের এক শিক্ষক নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে একই গ্রামে বাস করেন। যুদ্ধের সময় আর দশজনের মতোই দিন কাটে তার। ধলা গ্রামটি ভৌগোলিক অবস্থানে অনেক ভিতরের দিকে হওয়ায় পাক বাহিনীর অপতৎপরতা তেমন ছিল না। কিন্তু এ চিত্র যুদ্ধের প্রথম দিকের। জুন মাসের দিকে ধলা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কাঞ্চন নদীর অপর প্রান্তে চর হাজরা গ্রামে মিলিটারির গানবোট ভিড়ল। জনৈক ইয়াকুব আলী সাহেবের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়ার সময় মিলিটারি তার দুই মেয়ে আর ছেলের বউকে তুলে নিয়ে চলে গেল। এ ঘটনায় ধলা গ্রামেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সেপ্টেম্বর মাসের ছাব্বিশ তারিখে মুক্তিবাহিনী মিলিটারির একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দিলে পাক আর্মির এক জওয়ান সাঁতরে তীরে ওঠে। সে আশ্রয় নেয় স্কুল শিক্ষকের সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর কাছে। শিক্ষকের স্ত্রী পবিত্র কোরানশরীফ স্পর্শ করিয়ে ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্য স্বামীর কাছে অনুরোধ জানায়। কিন্তু শিক্ষক ছেলেটিকে তুলে দেয় মুক্তিবাহিনীর হাতে। ঐ রাতেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। গল্পকথক বা শিক্ষকের স্ত্রী সন্তান জন্মদানকালে মারা যায়। উপরিউক্ত ঘটনাটিই কথকের মনে সঞ্চারিত করে পাপবোধ। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন পরকালের। বিধাতা পাপ-পুণ্যের বিচার কীভাবে করেন সেটা দেখার ইচ্ছায়।
প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনে রাজনীতি-সমরনীতি কতটা ক্ষত তৈরি করে তা আমরা লেখকের অন্যান্য ছোটগল্পে দেখেছি। কিন্তু এ গল্পে লেখক দেখালেন ব্যক্তিমানুষের অন্তরের ক্ষত। রাজনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করলেও সে রেহাই পায়নি কেন্দ্রের অস্থিরতা থেকে। যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এমনই।

গল্পটি প্রাণ পেয়েছে লেখকের দক্ষ পরিচর্যার কারণে। মানসিক দ্বন্দ্ব জিজ্ঞাসাকে যথার্থ রূপ দেওয়ার জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সঙ্কট মুক্তিযুদ্ধের সময়কে। গল্পটিকে বিশ্বস্ততা দেওয়ার জন্য তিনি প্রাকৃতিক কিছু পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। যেমন– পাকিস্তানি ছেলেটি যেদিন স্কুল শিক্ষকের দৃষ্টিগোচর হল সেদিন ছিল তুমুল বর্ষণ। ঝড়-বৃষ্টির রাত। অন্ধকার ছিল ভয়ানক। লেখক বর্ণনা করছেন–'বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। একসময় প্রায় ঝড়ের মতো শুরু হলো। বাড়িঘর কাঁপতে শুরু করলো।'[১] পাক আর্মির আশ্রয়ের জন্য প্রায় নির্জন একটা বাড়ি এবং ঝড়-বৃষ্টির সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের নির্দিষ্ট উল্লেখে গল্পটির গতি যেমন বেড়েছে, তেমনি পাঠকের মনে তৈরি হয়েছে বিশ্বস্ততা। যেমন–

– জুন মাসের ১৯ তারিখ চর হাজরা গ্রামে মিলিটারির গানবোট ভিরল।
– দুপুরে খানা খাওয়ার জন্যে খাসি জবেহ করলেন।
– জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনী দেখা দিল।

[১] . গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৭৪৭

– সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে অবস্থার পরিবর্তন হল।

– লঞ্চ ডুবার ঘটনা ঘটল সেপ্টেম্বর মাসের ছাব্বিশ তারিখ।

– সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখের ঘটনা।

চিরায়ত বাংলার গ্রামীণ জীবনে ছিল স্থিরতা-সমৃদ্ধি। যুদ্ধের ভয়াবহতা গ্রামগুলোকে অস্থির করে তোলার পূর্বে গ্রামের মানুষগুলো নিজেদের নিয়ে সুখেই ছিল বলা যায়। ধলা গ্রামের চিত্রটিও এমনই সুখ-সমৃদ্ধির– 'ধলা বড় সুন্দর গ্রাম। একেবারে নদীর তীরের গ্রাম। নদীর নাম কাঞ্চন। মাছ খুবই সস্তা। জেলেরা নদী থেকে টাটকা মাছ বাড়িতে দিয়ে যায়। তার স্বাদই অন্য রকম।'[১] পনেরো বছর পূর্বের পাবদা মাছের স্বাদ এখনো কথকের মুখে লেগে আছে। শীতের সময় বোয়াল মাছ থাকত তেলে ভর্তি। গ্রামগুলোর রূপান্তর হয়েছে অস্বাভাবিক গতিতে। এখন সেখানেও রাজনীতি ঢুকেছে। দলাদলি মারামারির চূড়ান্ত পরিণতি সেখানেও। আজকাল গ্রাম বলতেই ভিলেজ পলিটিক্সের কথা মনে আসে।

গল্পকথক শিক্ষকের অন্যরকম মর্যাদা ছিল গ্রামে। যেকোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকে সম্মানের সাথে দাওয়াত করা হতো। গ্রাম্য সালিসিতে তার বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হতো। গল্পকথকের এসব বিবরণে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ক্ষমতার প্রান্তে অবস্থান করলেও উন্মীলিত কেউ নন। তার সামাজিক অবস্থানটি স্পষ্ট। এ গল্পে লেখকের যে অভিপ্রায় তাতে কথকের ধর্মবিশ্বাসটিও গুরুত্ব বহন করে।

কথকের মতে 'গজবের হাত থেকে বাঁচার জন্য মসজিদে কোরআন খতম দেওয়া হলো । এক লাখ চব্বিশ হাজার বার সূরা এখলাস পাঠ করে গ্রাম বন্ধ করা হলো।'[২] এসব ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কথকের পূর্ণবিশ্বাস এবং সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার ধর্মবিশ্বাস প্রবল ছিল বলেই পবিত্র কোরান ছুঁয়ে শপথ ভাঙার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। কথক দুটি কারণে দ্বান্দ্বিক হয়ে ওঠে। প্রথমত নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করে স্ত্রীকে দেওয়া কথা সে রাখতে পারেনি। পাকিস্তানি আর্মি তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে- একথা জানাজানি হলে রাজাকার হিসেবে তার বিচার হবে। দেশের মানুষ তার গায়ে থু দিবে। তার সামাজিক যে মর্যাদা তা ক্ষুণ্ন হবে। সুতরাং মুক্তিবাহিনীর হাতে একে তুলে দেওয়াই কর্তব্য। আবার ছেলেটার জন্য তার মায়াও লাগে। বাচ্চা ছেলে। এরা হুকুমের চাকর। বেচারা জীবনই শুরু করেনি দেশে ফিরে বিয়ে-শাদি করবে, সুন্দর সংসার হবে। তবে তার এ আবেগ নিজের ভয়ঙ্কর পরিণতির চিন্তায় উবে যায়। ফলে পবিত্র কালাম স্পর্শ করে যে কথা সে দিয়েছে তা রাখতে পারেনি।

১ . গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা-৭৪৫

২ . প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৭৪৬

কথকের স্ত্রীর চরিত্রটিও লেখকের অভিপ্রায় সিদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সে গাছপালা দিয়ে বাড়ি ভরে ফেলল। গাছগাছালির খুব শখ। পনেরো-ষোল বছর বয়সের তরুণীর কাছে যুদ্ধের নীতির চেয়ে মানবিক দাবিটি গুরুত্ব লাভ করেছে। সে সাত মাসের সন্তান-সম্ভবা। নিজের ভিতের একটি প্রাণ দিন দিন বেড়ে উঠছে। এমন সময় অন্য একটি প্রাণকে বাঁচানোর তাগিদ তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পাকিস্তানি আর্মিটি তাকে 'বহেনজি' বলে সম্বোধন করে। নারীর সহজাত মাতা-ভগ্নি রূপটি প্রবল আবেগে এগিয়ে আসে তার জীবন রক্ষার্থে। ছেলেটির সাথে আরও আলাপ হয় তার। ছেলেটির পকেটে সবসময় রেশমি নামের এক মেয়ের ছবি থাকে। যুদ্ধের পর দেশে ফিরে গিয়ে সে মেয়েটাকে বিয়ে করবে। ছেলেটির হৃদয়ে লালিত সুন্দর গার্হস্থ্য জীবনের স্বপ্নটি কথকের স্ত্রীকে যেন আন্দোলিত করে। ফলে সে আরো বেশি আবেগী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো কথকের স্ত্রীর সন্তান-সম্ভবা হওয়া। কথকের মতে, পোয়াতি অবস্থায় মেয়েদের মধ্যে অনেক গাগলামি ভর করে। অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা বশত কথক ঘটনা না শুনেই কথা দেয়। এর ফলেই সঙ্কটটি ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

কথকের স্ত্রীর মৃত্যুও তার মনে পাপবোধ জন্ম দেওয়ার অন্যতম কারণ। স্ত্রী বেঁচে থাকেলে হয়তো কথকের যুক্তিগুলো তার সামনে তুলে ধরতে পারতো। তার এই না থাকার কারণেও কথকের মানসিক যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছে। যদিও তিনি বলেছেন স্ত্রী মারা যাওয়াতেই বরং ভালো হয়েছে। কেননা বেঁচে থাকলে তার ঘৃণা নিয়ে প্রাত্যহিক জীবন হয়তো আরও জটিল হতে পারতো।

'পাপ' গল্পটি কথক যাকে শোনাচ্ছেন তার পরিচয় আমরা পাই কথকের দু-একটি সংলাপে। কথক তাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন। কথকের মতে তার শ্রোতা 'জ্ঞানী মানুষ' এবং 'অনেক কিছু জানেন।' বোঝা যায় গল্পের শ্রোতা একজন নাগরিক মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত। গল্পবলার কৌশলের কারণে গল্পে না থাকা এ চরিত্রটির উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। গল্পের শ্রোতা 'জ্ঞানী মানুষ' এবং 'অনেক কিছু জানলে'ও অনেক বিষয়ে যে তারা অতিকথনটিই জানে কথক একথাটি কৌশলে বলে ফেলেছেন। 'আপনি আমার চেয়ে হাজার গুণে বেশি জানেন'– এ কথা বলার পরই কাঞ্চন নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় 'শতাধিক মিলিটারির প্রাণ সংহারের' অতি কথনের বিষয়টিও ধরিয়ে দেয় সে। চরহাজরা গ্রামের ইয়াকুব আলী সাহেব কেন মিলিটারিদের খুব সমাদর করলেন সে বিষয়টিও শ্রোতাকে বোঝাতে ভোলেনি কথক। তথাকথিত নাগরিক সমাজ সে যুদ্ধের অনেক সত্যিকার ইতিহাসই জানে না এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারে না– কথকের বিনয়মিশ্রিত তীক্ষ্ণ খোঁচায় কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কথকের 'যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস ভাই সাহেব', 'যুদ্ধ অতি সাধারণ মানুষকেও হিংস্র করে ফেলে', 'যুদ্ধে শুধু পাপের চাষ হয়'– উক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে তার যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। আর এরই মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে মানবতার অনুসন্ধান। ধর্ম-অধর্মের দ্বৈরথ পেরিয়ে মানবিক জিজ্ঞাসাই স্ফূর্তি লাভ করে। পাপ-পুণ্যের মীমাংসা নাকি মানবতার অনুসন্ধান কোনটি যে লেখকের

অভিপ্রায় তা যেন পাঠককে দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। এ গল্প বলা শেষ হয়নি। কথক 'স্কুল শিক্ষক' আরো অনেকের কাছেই এ গল্প বলে বেড়াবে। আপাতত সে চাইবে পাপ-পুণ্যের মীমাংসা কিন্তু তার অন্তরাত্মা খুঁজে বেড়াবে মানুষকেই– যারা ছিল তাদের আর যারা আছে তাদের।

হুমায়ূন আহমেদের 'আমার আপন আঁধার' গ্রন্থের স্মৃতিচারণমূলক লেখা 'হোটেল আহমেদিয়া'। লেখকের বয়ান কৌশলে এটিকে স্মৃতিকথা না বলে ছোটগল্পই বলা যায়। একটি সার্থক ছোটগল্পের সকল বৈশিষ্ট্যই এ গল্পে মেলে। গল্পটিতে নগরজীবনের যুদ্ধকালীন সঙ্কট ফুটে উঠেছে। এ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাকিস্তানি মিলিটারির অমানবিক নির্যাতনের খণ্ডিত চিত্র পাওয়া যায়।

লেখক তখন মহসিন হলের ৫৬৪ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র। যুদ্ধের শেষ পর্যায়। রোজার মাস। ইতোমধ্যেই তাঁর পুলিশ অফিসার বাবা মিলিটারির হাতে শহিদ হয়েছেন। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য লেখক নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লেখক কেন যুদ্ধে যাননি তার কারণ হিসেবে বলেছেন– 'এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুকে স্বীকার করে নেবার মতো মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। আমি জন্মেছি ভীতু হয়ে।'[১] লেখকের নানাজান তাঁকে ও তাঁর ছোটভাইকে বাঁচানোর জন্য নিজের অনিচ্ছায় এবং অনুপস্থিতিতে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। মূলত এটি ছিল তাঁর একটি কৌশল। মিলিটারিদের গুলির মুখ থেকে গ্রামের অনেককেই তিনি বাঁচিয়েছেন। পরে অবশ্য তাদের কারণেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। গল্পে এ প্রসঙ্গটি অত্যন্ত হৃদয়াবেগ দিয়ে বর্ণনা করেছেন লেখক।

সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকাই ছিল নিরাপদ। পাকিস্তানিদের বোঝানো যে আমরা পাকিস্তানিদের পক্ষে, মন দিয়ে ক্লাস করছি, যুদ্ধে যাইনি। লেখক খাওয়ার কষ্ট লাঘব করার জন্য নিজ কক্ষে নিজ নামে 'আহমেদিয়া ভাতের হোটেল' খুললেন। ক্রমে এর সদস্য সংখ্যা হলো দশজন। এক রোববার ইমপ্রুভ ডায়েটের ব্যবস্থা করা হলো– ভুনা খিচুরি, ডিম ভাজা এবং কলিজি। সকাল থেকেই রান্নার আয়োজন চলল। সদস্যদের আগ্রহের সীমা নেই। দুপুর দুইটার সময় খেতে বসলেন সবাই। ঠিক সে সময় মিলিটারি হল ঘেরাও করল। লেখকসহ চারজনকে খোলা ট্রাকে তোলা হলো। আনবিক শক্তি কমিশন ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের। সেখানে আরও অনেককে ধরে আনা হয়েছে। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মিলিটারিদের নির্যাতনের নমুনা চিত্র বর্ণনা করেছেন এভাবে– 'তারপর বীভৎস চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। সে চিৎকার মানুষের চিৎকার নয়– পশুর চিৎকার।'[২]

[১]. আমার আপন আঁধার, প্রতীক, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৮২

[২]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫

সেদিন লেখক অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরে এলেন জনশূন্য মহসিন হলে। একসময় যুদ্ধ শেষ হলো। দুঃসময় দূর হলো। বিশ বছর কেটে গেলো। এক ভয়ঙ্কর রোববারের ভুক্তভোগী লেখকের অনেক বন্ধুই ইতোমধ্যেই মারা গিয়েছেন। আবার কারো কারো সাথে দেখাও হয়ে যায় মাঝে মাঝে। এমনই এক দিনের ঘটনা বলেছেন লেখক। লেখকের বন্ধু সেদিন তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাড়িতে যাচ্ছিলেন। লেখককে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন– 'আরে তুই?' বন্ধুটি লেখকের হাত ধরে তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন– 'এর নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমরা একবার একটি হোটেল দিয়েছিলাম– আহমেদিয়া হোটেল। হুমায়ূন ছিল সেই হোটেলের বাবুর্চি।'[১] বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। ছেলেমেয়েরা বাবার কর্মকাণ্ডে অবাক। লেখক আর তাঁর বন্ধুটি আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের চোখের সেই অশ্রুর কারণ স্পষ্ট করতে পারলেন না। কোনোদিন হয়তো পারাও যাবে না। সত্যিই যে ভয়ঙ্কর দুঃসময় আমাদের পূর্বপুরুষেরা পার করেছেন তা হয়তো কোনোদিনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে না।

কারণ, এমন কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে যার ভিতর দিয়ে না গেলে কখনো তার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। এ গল্পে লেখকের ব্যক্তিগত সঙ্কটটি যেন যুদ্ধকালীন নাগরিক জীবনের সামষ্টিক সঙ্কটের প্রতিনিধিত্ব করে। গল্পটির পরিসমাপ্তিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি লেখকের আশীর্বাদপুষ্ট বাৎসল্যপ্রীতি প্রাণময় ভাষায় গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

যুদ্ধোত্তরকালের গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবনের পট-পরিসর বিত্রিত হয়েছে 'শীত', 'অসুখ', 'শ্যামল ছায়া', 'নন্দিনী', 'জনক', 'পঙ্গু হামিদ' ও 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পে। মুক্তিযুদ্ধকে হুমায়ূন আহমেদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস নিয়েছেন। গল্পে কেবল হতাশা-নৈরাজ্যের চিত্র অঙ্কনই তাঁর একমাত্র অভিপ্রায় নয়। স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা নির্দ্বিধায় আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের মর্মলোকে প্রবেশ করে গল্পকার তুলে এনেছেন একগুচ্ছ নিঃশব্দ বেদনার হাহাকার যা ইতঃপূর্বে আমরা পাইনি।

সর্বহারা নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-সংগ্রামের চিত্র আছে 'শীত' গল্পে। লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে যুদ্ধোত্তর সময়ের নিরন্ন-অসহায় মানুষের জীবনাচরণ বর্ণনা করেছেন। উদ্ধার করেছেন তাদের চাওয়া-পাওয়ার ফিরিস্তি।

বৃদ্ধ মতি মিয়ার একমাত্র উপার্জনক্ষম পুত্র মেছের আলী মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তার নামে নীলগঞ্জে একটি রাস্তার নামকরণও হয়েছে– 'শহিদ মেছের আলী সড়ক'। এই স্মৃতিচিহ্ন মতি মিয়ার পারিবারিক ভিত্তি নির্মাণে সহায় হয়নি। মতি মিয়ার সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হয়নি। তার পুত্রবধু

[১] আমার আপন আঁধার, প্রতীক, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৮৭

এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করে আহারের যোগান দেয়। জীবনের প্রতি পলে পলে মেছের আলীর অভাব বোধ করে ছোট্ট সংসারটি। মেছের আলীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ পরিবারের সচ্ছলতার মৃত্যু হয়েছে। নিজ গ্রামের বাজারে ভিক্ষাও করতে হয়েছে মতি মিয়াকে। তবু কারো প্রতি কোনো অভিযোগ নেই মতি মিয়ার। যুদ্ধে ছেলের মৃত্যু তার কাছে স্বাভাবিকই মনে হয়। ছেলের আত্মাহুতির জন্য গর্বও হয় তার। সুযোগ পেলেই ছেলের জীবন উৎসর্গের কথা জানিয়ে দেয় সকলকে। প্রচণ্ড শীতে একটি কম্বলের দাবি শীতার্ত শহিদ পিতার কাছে যথার্থই মনে হয়। হক আছে বলেই নানা চেষ্টা তদবির করে কখনো পায় সে একটি কম্বল ও পঞ্চাশটি টাকা। গভীর তৃপ্তিতে ঘুমানোর আয়োজন করে মতি মিয়া। ছেলের প্রতি গাঢ় কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় তার। কিন্তু ঘুম হয় না মেছের আলীর স্ত্রী ফুলজানের। তার কান্না দূর হয় না। প্রথম প্রথম সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে গিয়ে জীবনের কদর্য দিকগুলো সে দেখেছে। এখন তাই সে আর কারো কাছে যায় না স্বামীর আত্মাহুতির দাবি নিয়ে। এ গল্পটি হয়ে উঠেছে একটি শহিদ পরিবারের প্রতি রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি।

অনিঃশেষ মমতায় দ্রবীভূত হয়ে পাঠক এ গল্পে প্রত্যক্ষ করেন যুদ্ধের কারণে নিম্নবিত্ত একটি পরিবার কতটা সঙ্কটে পতিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তরকালে প্রান্তিক মানুষের চাওয়া-পাওয়ার হিসাবটি লেখক সযত্নে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। কত সামান্য তাদের দাবি! একটিমাত্র কম্বল এনে দিয়েছে শান্তির ঘুম, দুবেলা আহারের সংস্থান জীবনে এনে দেয় স্বস্তি। একাত্তর-পরবর্তী সময়ে অনেকের বাণিজ্যলক্ষ্মীই প্রবল বেগে ভাগ্যের সূতাকে মিহি ও মোটা করে তুলেছে। কেবল মাটিঘেঁষা মানুষেরাই জীবনের স্বাচ্ছন্দকে হারিয়েছে। তাদের ভাগ্যলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছে তল্পিতল্পাসহ। যুদ্ধ সুবিধাভোগী বুর্জোয়া সম্প্রদায়কে উষ্ণতা দিয়েছে দু হাত প্রসারিত করে। অথচ মতি মিয়া-ফুলজানদের শীত দূর হয়নি।

যুদ্ধোত্তর গল্পগুলোতে হুমায়ূন আহমেদ যুদ্ধের বাহ্যিক ক্ষতের চেয়ে বড়ো করে দেখেছেন হৃদয়ের ক্ষতকে। যুদ্ধে মানবিক অবক্ষয়ের চিত্রটি তাঁর মানসলোকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ‘অসুখ’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে। একজন মা যিনি তার পুত্রকে হারিয়েছেন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন যখন জানতে পারেন তার খোকনকে মিলিটারিরা ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জবাই করেছে। ছেলের এই নির্মম মৃত্যু মা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর কাছে যুদ্ধে ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু মৃত্যু-প্রক্রিয়ার নিষ্ঠুরতাকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

পাকিস্তানি মিলিটারিদের বীভৎস হত্যাকাণ্ড বিবেককে আন্দোলিত করে, সীমাহীন ক্রোধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে মানুষকে করে তোলে অস্বাভাবিক, মানসিক বিকারগ্রস্ত। বীরপ্রসবিনী খোকনের মা সেই অস্বাভাবিকতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। তাকে সাময়িক প্রশান্তি দেওয়ার জন্য তাই প্রয়োজন হয় মিথ্যা আশ্বাসের। কায়দা করে তাকে শোনাতে হয় – না, হত্যাকাণ্ডটি ওরকম বীভৎস ছিল না।

'মেথিকান্দা অপারেশনে খোকনের তলপেটে গুলি লেগেছিল' – একথা শুনে মা কিছু দিনের জন্য আশ্বস্ত হন, স্বাভাবিক আচরণ করেন। তাই মিথ্যা আশ্বাসের জন্য মাঝে মাঝেই ডাক পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীর, খোকনের বন্ধু রঞ্জুর।

বেকার যুবক রঞ্জু একটি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরে ঢাকার সমস্ত অলিগলি। বেকার জীবনের হাতাশা-গ্লানি অত্যন্ত বাস্তবিক হয়ে উঠেছে রঞ্জুর ভাবনায়–'এখন যদি কেউ আমাকে বলে অমুক লোকের বাড়ির সামনে দিয়ে দশবার ডিগবাজি খেলে আমার একটি চাকরি হবে। আমি সম্ভবত তাও করব।'[১]

সমকালীন বাস্তবতার চিত্রটি রঞ্জু চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বেকারত্ব রঞ্জুর কাছে যুদ্ধের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি।

ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণার মাঝেও বিড়ম্বনা হয়ে দেখা দেয় খোকনের মাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়ার কাজটি। রঞ্জু যে কাজটি অনাগ্রহের সঙ্গে করছে তা বোঝা যায় বারবার তার অবস্থান পাল্টানোর মানসিকতায়। তার বন্ধুর বাবা, আবার তার শিক্ষকও যিনি, তাকে সে মিথ্যা বলে, ভুল ঠিকানা দেয়। ঐ বাড়িতে না যাওয়ার পেছনে আরও একটি কারণ অবশ্য রঞ্জুর ছিল। আর সেটি হলো – খোকনের ছোটবোন নীলুকে রঞ্জু পছন্দ করতো। নিজের কাছেই সবদিক থেকে ব্যর্থ হওয়া রঞ্জু তাই নিজেকে আড়াল করতে চায় সবার কাছ থেকে।

চাইলেই তো আর জীবনের সব দিকে থেকে পালিয়ে থাকা যায় না। তাই রঞ্জুও পালাতে গিয়েই বারবার ধরা পড়ে। সেই মিথ্যা সান্ত্বনার আড়ালে প্রকৃত সত্যটি মনে পড়লে সীমাহীন ক্রোধ জাগ্রত হয়ে পড়ে রঞ্জুর নিজেরও। এক সময়ের ভালো লাগা নীলু যার বিয়ে হয়েছে 'ভালো মানুষ' টাইপ ছেলের সঙ্গে তাকে সে অবলীলায় মিথ্যা বলতে থাকে– 'নীলুর সঙ্গে যে আমার প্রেম ছিল সেটা আপনি জানেন নাকি ভাই? দারুণ লদকা-লদকি ছিল।'[২] অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো রঞ্জু বলতে থাকে। কত বিচিত্র মানুষের মানসিক ক্রিয়া। একজনকে মিথ্যা বলছে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যে, আরেক জনকে মিথ্যা বলছে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনকে তছনছ করে দেয়ার জন্য। বন্ধুর বীভৎস মৃত্যু-স্মৃতি, মিথ্যা সান্ত্বনার বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করা এবং গ্লানিময় বেকার জীবনের যন্ত্রণাদাহ-এসবের মিশ্রণেই ব্যক্তিমানুষ ক্ষতবিক্ষত হয় মন ও মননে, ভাব ও ভাবনায়। অসুস্থ মন অসুস্থ চিন্তার যোগান দেয়। ফলে মানুষ হয়ে ওঠে বিকারগ্রস্ত।

নিম্নবিত্ত পরিবারের যুদ্ধোত্তর কালের দুঃখ-যন্ত্রাণার চিত্র আছে 'শ্যামল ছায়া' গল্পে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময়কে এই গল্পে ধরা হয়েছে।

[১] . গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১১৭

[২] . প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১২০

'লেখাপড়া না-জানা মূর্খ বাপ-মার ছেলে যদি বৃত্তিটৃত্তি পেয়ে পাস করতে করতে এম. এ. পাস করে ফেলে তাহলে সে দুর্বোধ্য হয়ে উঠে।'[১] এমন ভাবনা মজিদের মা রহিমার। গল্পটি বর্ণিত রহিমার দৃষ্টিকোণ থেকে। তার অতীত স্মৃতি কখনো মধুমাখা আবার কখনো বিষাদে পূর্ণ। অর্থকষ্ট থাকলেও চমৎকার গার্হস্থ্য জীবন ছিল রহিমার। 'মজিদের বাপ লোকটা আমোদ-আহ্লাদের কাঙাল ছিল' তাই সে ছেলেকে না জানিয়ে তার বিয়ে ঠিক করে রাখে সুতাখালীর হাসিনা নামের এক শ্যামলা মেয়ের সাথে। কিন্তু মজিদ তো তাদের কাছে দুর্বোধ্য। দেশে কী একটা সমস্যা চলছে। মজিদ ও তার কয়েকজন বন্ধু রাত জেগে কীসব মিটিং করে, গলা নামিয়ে কীসব বলে। রহিমা কান পেতে শোনে সেসব কথা, আলোচনা হয় যুদ্ধ-স্বাধীনতা এসব বিষয়ে। রহিমা বুঝতে পারে তাদের মজিদ যুদ্ধে জড়িয়ে পরেছে। আর প্রেমেও যে পড়েছে সেটিও রহিমা ঠিক বুঝতে পারে। 'একটুও সাজগোজ করে না, তবু কী সুন্দর লাগে তাকে'[২]–শিখা নামের মেয়েটির কথা শুনতেও ভালো লাগে রহিমার। মজিদ ও শিখার কাব্যিক প্রেমময় সংলাপ শোনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে সে–

> সে হাসতে হাসতে দরজায় ধাক্কা দেয়। ভেতর থেকে মজিদ গম্ভীর হয়ে বলে -কে কে?
> – 'আমি, আমি শিখা।'
> – অগ্নিশিখা নাকি?
> –'না, আমি প্রদীপশিখা।'
> বলতে বলতে মেয়েটা হাসিতে ভেঙে পড়ে।[৩]

একসময় পুরোপুরিভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। অজানা রোগে ইতোমধ্যে মারা যায় মজিদের বাবা। মজিদের মাকে গ্রামে পাঠিয়ে মজিদ চলে যায় সম্মুখ-সমরে। ছেলেকে নিয়ে নানা দুশ্চিন্তায় দিন কাটে তার। একেক দিন একেক রকম ভয়ঙ্কর উড়ো সংবাদ শোনে রহিমা। রাত কাটে নির্ঘুম। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যায়। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় মৃত্যু বুঝি এসে বসেছে বুকের ওপর। যুদ্ধ থেমে গেল। রহিমার এই অসুখটা বেড়ে গেল মজিদ যেদিন ক্র্যাচে ভর দিয়ে ফিরে এলো হাসিমুখে। ক্র্যাচের খটখট শব্দ তুলে মজিদ যখন এক পায়ে হেঁটে বেড়ায় তখন রহিমার বুক ধড়ফড় করে। সন্তানের বীভৎস পরিণতি মাকে করে তোলে শোক-বিহ্বল। যুদ্ধ-ফেরত ছেলের আহত অবস্থা মাতৃহৃদয়কে করে ক্ষতবিক্ষত।

যুদ্ধ মজিদের জীবন থেকে অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন নিয়েছে, পিতার স্বপ্ন নিয়েছে, প্রেমকেও কেড়ে নিয়েছে। তবু জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাছে একটি স্বাধীনতার কাছে এ ক্ষতি খুব সামান্য বলে মনে হয়। কিন্তু মায়ের কাছে ছেলের ক্ষতি অসামান্য ও অপূরণীয় বলেই মনে হয়। রহিমা মজিদের মতো ভাবতে পারে না কারণ, জীবন তার সুবিশাল বাহু রহিমার দিকে প্রসারিত করেনি। ছেলের রাতজাগা তাকে চিন্তিত করে।

[১] . গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪০৫

[২] . প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৬

[৩] .প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৭

হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসা নিয়ে আহত সন্তানের পাশে ছায়ার মতো থাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে রহিমা। যুদ্ধে তারুণ্যের ত্যাগের মহিমা এবং সন্তানের প্রতি মায়ের বিচলিত স্নেহ গল্পটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

যুদ্ধে নারীর আত্মত্যাগের মহিমাকে হুমায়ূন আহমেদ একাধিক প্রান্ত থেকে দেখিয়েছেন। মায়ের চোখের জলের প্লাবন যেমন দেখিয়েছেন (অসুখ, শ্যামল ছায়া) তেমনি প্রণয়িনী নারীর ত্যাগের মহিমাও মূর্ত হয়ে উঠেছে 'নন্দিনী' গল্পে। যুদ্ধকালীন আশ্রয়ের জন্য মানুষের ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনাটিও এ গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। সুরেশ্বর বাবুর মেয়ে নন্দিনী। তাকে মিলিটারিরা মেরে ফেললে পিতৃহারা নন্দিনী আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। একদিকে নারী, তারপরও হিন্দু। সুতরাং সঙ্কটটি ভয়াবহ রূপে আবির্ভূত হয় নন্দিনীর জীবনে। নন্দিনী আশ্রয়প্রার্থী হয় বন্ধু মজিদের। হয় কোনভাবে তাকে বর্ডার পার করে দিক আর না হয় মজিদ তাকে বিয়ে করুক– এই ছিল নন্দিনীর বিনীত অনুরোধ। কিন্তু মজিদ তা প্রত্যাখ্যান করে। নানা জায়গায় নন্দিনীর আশ্রয় খুঁজে দিতে সে সচেষ্ট হয় কিন্তু নিজে সে আশ্রয় হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ একসময় নন্দিনীকে এক নজর দেখার জন্য কতই না কৌশল করেছে সে। মানবজীবন হয়তো এমনই বিচিত্র। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি হয়তো কেউ-ই করতে পারে না। মজিদ নন্দিনীর জীবনে ত্রাতার ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ফলে নন্দিনী নিজেই আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। ধর্মান্তরিত হয়ে অবশেষে আজিজ মাস্টার নামের এক রাজাকারকে বিয়ে করে সে। তার স্বামী পরে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা যায়। ফলে নন্দিনী পড়ে থাকে শাশুড়ির সাথে স্বামীর বাড়িতেই।

যুদ্ধের পর এককালের রোমান্টিক যুবক মজিদ যখন আবার আবিষ্কার করে নন্দিনীকে তখন সে তার শেকড় গেড়েছে ধর্মতলার হাড়িখাল নদীর তীরবর্তী বাড়িটিতে যেখানে তার গাঁটছাড়া বাঁধা হয়েছিল চরম দুঃসময়ে। মজিদের কণ্ঠে আজ অভিমান আর অভিযোগের সুর- 'মেয়ে মানুষের মুখে থু থু দেই। তুই হারামজাদী ঐ বাড়িতে পড়ে আছিস কী জন্যে? কী আছে ঐ বাড়িতে?'[১]

কিন্তু নন্দিনী যাবে কোথায়? কোনো সুখী গার্হস্থ্য জীবন কি তাকে সাদরে গ্রহণ করবে? ধর্মান্তরিত, সঙ্কটে পতিত এসব নারীকে আমাদের সমাজ যে দুহাতে ঠেলে পতিতালয়ের দিকে পাঠাবে একথা মজিদ না জানলেও নন্দিনী জানে। নন্দিনীর আশ্রয় তাহলে কে হবে সভ্য সমাজে? মজিদ? সে সাহস অবশ্য মজিদ আজো দেখায়নি। আজ ডাকলেও যে নন্দিনী আসবে না সেটা নন্দিনীর ব্যক্তিত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নন্দিনীর ব্যক্তিত্ব প্রবল বলেই নিঃস্ব, একাকী পড়ে আছে নির্জন আঁধারে। এ গল্পে মজিদ ও নন্দিনীর প্রণয় কাহিনিটুকু পড়লে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কুসুম ও শশী ডাক্তারের প্রণয় প্রসঙ্গটি মনে পড়ে, যদিও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৩৬

যুদ্ধোত্তর হাতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের বিপরীতে ভিন্নধর্মী ছোটগল্প 'জনক'। মতি নামে এক যোদ্ধার নিকট স্বাধীনতা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য বা লাভ-লোকসানের হিসাব নয়। তার নিকট 'স্বাধীনতা অনেক বড় ব্যাপার'। ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার হিসাব মতি করে না। লেবার সর্দার মতির বয়স পঞ্চাশ। জয়গুন তার স্ত্রী। দুই মাস এগারো দিনের শিশুপুত্র মনোয়ার হোসেন মতির শেষ বয়সের ফসল। অভাব-অনটনের সংসার মুক্তিযোদ্ধা মতির। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো অভিযোগ নেই, হাতাশা নেই। যুদ্ধের পর অনেকেই নানা কৌশলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্ফীত হয়ে উঠলেও রোগে জর্জরিত মতি চিকিৎসার টাকাও যোগাড় করতে পারে না। তার স্ত্রী এ নিয়ে অভিযোগ করলেও মতি জবাব দেয়; বৈষয়িক লাভ-লোকসানের হিসাব করার জন্য সে যুদ্ধ করেনি।

শিশুপুত্রের প্রতি অপরিসীম মমতা মতির। যদিও কাজের চাপে সন্তানকে সময় দিতে পারে না সে। পুত্রের সাথে মতি মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরেজি কথা বলে। 'সংগ্রামের সময়' শিখেছিল সে। রাতে শিশুর কান্নায় প্রায়ই ঘুম ভাঙে মতির। জয়গুনকে ডেকে তুলে ছেলের মুখে দুধ দিতে বলে মতি। জয়গুন ছেলেকে মাঝে মাঝে 'টুনা মিয়া' বলে ডাকে। এতে মতি বিরক্ত হয়। তবু স্ত্রীকে সে কিছুই বলে না। কারণ – কষ্ট করে সন্তান প্রসব করেছে। সামান্য হলেও তার একটা দাবি আছে। তবে কোনো একদিন বুঝিয়ে বলতে হবে। পুত্রের নাম রাখার পেছনে মতির রয়েছে ঋণশোধের এক বীরত্বগাথা ইতিহাস। একাত্তরে 'মুরাদখালির ফাইটে' সতেরোজন যোদ্ধা অংশ নেয়। মতিসহ তিনজন কেবল বেঁচেছিল। আর সকলে শহিদ হয়। মতির কমান্ডার ছিলেন 'মনু ভাই'– ইউনিভার্সিটির ছাত্র, সুন্দর চেহারা, ভদ্র ব্যবহার। মতি ও তার বাহিনী সন্ধ্যাবেলা বোয়ালখালি বাজারে পাটগুদামের দিকে পজিশন নেয়। প্রথমে শুধু কয়েকজন রাজাকার মনে হলেও মুহূর্তেই মুহুর্মুহু গুলিতে সে ভ্রান্তি ঘুচে যায়। মিলিটারির সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। ডান পায়ে গুলি লাগে মতির। আহত মতিকে উদ্ধার করে কমান্ডার মনু ভাই। মতির ভাষায় – 'এই আমারে পিঠের মইদ্যে নিয়া মনু ভাই পাক্কা তিন মাইল দৌড়াইল। আমার জীবন রক্ষা হইল।'[১] ঘোর বিপদেও মনু ভাই মতিকে ফেলে আসেনি। এই কৃতজ্ঞতাবোধে বারবার তার চোখে জল আসে। রাতের আঁধারে মতি স্ত্রীকে যুদ্ধের গল্প বলে। কিন্তু বারবার শোনা এসব গল্পে জয়গুনের হয়তো আর আগ্রহ থাকে না বলেই সন্তান প্রসবের ধকলে ক্লান্ত জয়গুন ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে থাকে নবপ্রাণ অভ্যাগত শিশুপুত্র মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন। মতি গল্প বলে যায় –

> .... এর একমাস পরে মুরাদখালি ফাইটে মনু ভাই মারা গেলেন। মনে হইলেই কইলজা কামড়ায়। বুঝলিরে ব্যাটা, মনু ভাইয়ের নামে তোর নাম রাখছি। মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন। নামের ইজ্জত রাখন চাইরে ব্যাটা। বড় ইজ্জতদার নাম।[২]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৮১৫

[২]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮১৫

পুত্রের প্রতি পিতার কোনো বৈষয়িক দাবি এখানে নেই। বীরের ছায়া তিনি দেখতে চান সন্তানের মাঝে। সহযোদ্ধার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এ গল্পে প্রাণময় গাঁথুনিতে বর্ণিত হয়েছে। একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার দৃষ্টিতে স্বাধীনতার মহিমা ও এক বীরের প্রতি তার ঋণশোধের অভিনব পন্থার অনবদ্য আখ্যান 'জনক'।

একজন রাজাকারের মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার গল্প 'পঙ্গু হামিদ'। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হামিদের 'ফ্লাশব্যাক' ভাবনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে একাত্তরে রাজাকারদের বিধ্বংসী কর্মতৎপরতা। যুদ্ধের সময় হামিদ ধান কাটার কাজ করতে চলে যায় সিলেটের হাওর অঞ্চলে। রাজাকারে গেলে সত্তর টাকা বেতন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, লুটপাট, মদ, মেয়েমানুষের সাথে আনন্দ ফুর্তি– এসবের মোহে রাজাকারে যোগ দেয় হামিদ। স্বাধীনতার পর হামিদ ফিরে আসে একজোড়া বুট জুতা, খাকি শার্ট এবং প্যান্ট নিয়ে এবং মিনমিনে গলায় বলে সে নাম লিখিয়েছিল মুক্তিবাহিনীতে। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে। গ্রামের সকলে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে তাকে অতিথি করা হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে নিজের বীরত্বের কথা বলেছে। কীভাবে তারা একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়েছিল আর রাধা নামের এক হিন্দু মেয়েকে কীভাবে উদ্ধার করেছিল পাকিস্তানিদের হাত থেকে সে গল্পও বলেছে হামিদ দক্ষ অভিনেতার মতো। হামিদ এসব বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিড়ম্বনার মধ্যেও পড়েছে। সাংবাদিকরা যখন জানতে চেয়েছে 'সেক্টর নম্বর কত' সে মিনমিন করে বলেছে তার মূর্খতার কথা।

সহযোদ্ধার নাম জিজ্ঞেস করলে বলেছে 'ইয়াদ নাই'। তারপর কেটে গেল কত বছর। কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে পা পিছলে পড়ে কোমর ভেঙেছে হামিদ। এলাকার চেয়ারম্যান হাজী শামসুদ্দিন চৌধুরীর কূটকৌশলে ত্রিশ বছর পর 'যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে একটি হুইল চেয়ার আর দশ হাজার টাকা পেয়েছে সে। যদিও টাকাগুলো হামিদের পকেটে আসেনি। কারণ 'হুইল চেয়ার রিলিজ করতে এর চেয়ে বেশি টাকা নিজের পকেট থেকে গেছে' চেয়ারম্যানের।

এভাবেই দিন কাটছিল হামিদের। কিন্তু সঙ্কট তৈরি হল তার নাতনি সুধাকে কেন্দ্র করে। সুধা আর কাউকে থু থু দেয় না কেবল হামিদকে দেখলেই সে থু থু দেয়। এ মেয়েটির কর্মকাণ্ড হামিদকে শঙ্কিত করে। তার অতীত, তার শঠতা সব যেন সুধা জেনে ফেলেছে। আর মেয়েটা দেখতেও রাধার মতো। নামেও মিল খুঁজে পায় সে। তাই এতো বছর পর একাত্তরের স্মৃতি আজ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার কাছে। একাত্তরে রাধা নামের এক মেয়েকে আটকে রেখে হামিদ ও তার সহযোগীরা দীর্ঘদিন নির্যাতন করে। শেষে বস্তায় ভরে তাকে হাওরের পানিতে ফেলে হত্যা করা হয়। এখন প্রায়ই হামিদ স্বপ্নে ও কল্পনায় অতীতকে দেখতে পায়– 'যত বারই গেছে ততবারই বজ্জাত মেয়েটা মুখে থু থু দিয়েছে। আসলে হারামি। আদরের মর্যাদা বোঝে না।' হামিদ স্বপ্নে মাঝে মাঝে তার কমান্ডারকেও দেখে। তাকে সাথে নিয়ে সিদ্দিক কমান্ডার কেন যেন মাইলের পর মাইল দৌড়ায় প্রায় নগ্ন হয়ে। এ গল্পে একাত্তরে রাজাকারদের নিষ্ঠুর চিত্র আছে – 'সিদ্দিক

কমান্ডার ঠান্ডা মাথায় মানুষ জবেহ করত। এবং বলত মানুষ জবেহ করার সময় খবরদার কেউ বিসমিল্লাহ বলবা না। শুধু বলবা আল্লাহু আকবার।'[১] চেতন এবং অবচেতন মনে পঙ্গু হামিদকে তাড়া করে অতীতের ভয়ঙ্কর অপরাধসমূহ। তবে সে বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়– এমন নয়। কোনো ন্যায়-অন্যায় তাকে ভাবিত করে না। সে ভালো থাকতে চায়, ঝামেলামুক্ত থাকতে চায়। তাকে ভাবিত করে নাতনি সুধা ও তার কর্মকাণ্ড। হামিদের ভাবনায় রাধাই যেন এতো বছর পর আবার ফিরে এসেছে তাকে যন্ত্রণা দিতে। তাই সে একদিন নির্জনে এক ভয়ঙ্কর অপকর্ম করে বসে – কুয়াতলায় একা পেয়ে বিকারগ্রস্ত যুদ্ধাপরাধী তার নাতনি সুধাকে কৌশলে কুয়ায় ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করে। গল্পটি অসাধারণ ব্যঞ্জনাধর্মী। দেশমাতৃকার সাথে যারা শঠতা করেছিল নিজেদের স্বার্থে তাদের কাছে স্বাধীন দেশও নিরাপদ নয়। নিজের অপরাধকে আড়াল করতে বিকারগ্রস্ত মনের অপ্রকৃতিস্থ ভাবনায় নিষ্পাপ শিশুকে হামিদের তাই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয়। ফলে শিশুকে হত্যা করে মানসিক স্বস্তি খুঁজে ভয়ঙ্কর অপরাধী পঙ্গু হামিদ।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গোটা জাতি যখন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল গল্পকার তখন জাতির সামনে তুলে ধরলেন পঙ্গু হামিদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার চিত্র।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তৎপর হয়ে ওঠা এক শহিদ পিতার প্রত্যয়-প্রত্যাশার গল্প 'জলিল সাহেবের পিটিশন'। জলিল সাহেবের দুটি ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তবু সন্তানের জন্য জলিল সাহেব বিচারপ্রত্যাশী নন। তাঁর কথা হলো –

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশ লাখ ইহুদি মারা গিয়েছিল। সেই অপরাধে অপরাধীদের প্রত্যেকের বিচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে অপরাধীরা কি করে পার পেয়ে গেল? কেন এ নিয়ে আজ কেউ কোনো কথা বলছে না। .... আমার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। ওদের মৃত্যুর জন্য আমি কোনো বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্য যাদের ওরা ঘর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে।[২]

অক্লান্ত পরিশ্রম, দীর্ঘদিনের ক্লান্তি, হতাশা আর তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জলিল সাহেব বিচারের জন্যে জনমত সংগ্রহের কাজটি করছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে। শেষ পর্যন্ত জলিল সাহেব দেশের নানা প্রান্ত ঘুরে ঘুরে বত্রিশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অধিক পরিশ্রম, শরীরের প্রতি অযত্ন-অবহেলায় হাঁপানি ও রিউমেটিক ফিভারে আক্রান্ত হয়ে একপর্যায়ে জলিল সাহেব মারা যান। গল্পকথক ও তাঁর কতিপয় বন্ধু জলিল সাহেবের দাবিকে অত্যন্ত যৌক্তিক মনে করে বিদেশের মাটিতে দেশের জন্য কিছু একটা করার জন্য গড়ে তোলেন 'আব্দুল জলিল সংগ্রাম কমিটি'। দেশে ফিরে গল্পকথক জলিল সাহেবের খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তিনি মারা গিয়েছেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৮৫২

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৩৫৫

মৃত্যুর সময় জলিল সাহেব তাঁর পিটিশনের সমস্ত কাগজপত্র নাতনির হাতে দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, একদিন কেউ না কেউ এই ফাইল নিতে আসবে। গল্পকথক 'আমি আবার আসব' একথা বলে চলে এলেন। নাগরিক মানুষ বৈষয়িক নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। বত্রিশ হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায় ঘোরার সময় আছে কার? গল্পকথকের এই আত্মজিজ্ঞাসা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে নাগরিক মানুষের বহুদিনের নির্লিপ্ত মানসিকতাকে স্পষ্ট করেছে। আমাদের চোখের সামনে 'জাতির পতাকা খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন' তবু আমরা ছিলাম সাক্ষীগোপাল। কিন্তু জলিল সাহেবের নাতনি হয়তো প্রতিদিন অপেক্ষা করে। কারণ 'এই বয়েসি মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।'[১]

এ গল্পে জলিল সাহেবের প্রত্যয়-প্রত্যাশা মূলত লেখকের নিজেরই। গল্পটির গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায় যখন দেখা যায়, স্বাধীনতার এতো বছর পর সত্যি সত্যি বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং হচ্ছে। জলিল সাহেবদের মতো মানুষদের প্রবল দেশপ্রেমে উজ্জীবিত দৃপ্ত প্রয়াসই এই বৃহৎ কর্মটি সম্পাদনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে মুক্তিযুদ্ধের যেসব প্রান্ত ও প্রবণতা আমরা পেলাম সংক্ষেপে সেগুলো হলো– গ্রামীণ সাধারণ মানুষ যাদের কাছে স্বাধীনতার বৃহৎ কোনো অর্থ নেই তারাও পাকিস্তানিদের প্রতি তাদের চরম ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তারাও সাহস সঞ্চয় করেছে, দেশপ্রেম দেখিয়েছে। গল্পগুলোয় আছে আধুনিক মানুষের যুদ্ধবিরোধী চেতনা। আছে রাজনীতি-সমরনীতি উপেক্ষা করে মানবপ্রেমে উত্তীর্ণ হওয়া আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বের স্বরূপ। নাগরিক জীবনে পাকিস্তানি মিলিটারিদের নিপীড়ন-নির্যাতনের চিত্র আছে। গল্পগুলোয় সর্বসহায়হারা মানুষের জীবনাচরণ বিধৃত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালের হতাশা-দারিদ্র্যের ভয়াবহতা আছে। যুদ্ধে সব হারিয়েও নাস্তি জীবনের চর্চা নয় বরং ইতিবাচক জীবনবোধে প্রত্যয়ী তারুণ্যের সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা বর্ণিত হয়েছে। সন্তানহারা জননীর হৃদয়ের ক্ষত দেখানোর প্রচেষ্টা আছে। আছে রাজাকারদের অপকর্মের চিত্র। নারী নির্যাতনের বাস্তবরূপ নির্মাণ করা হয়েছে। যুদ্ধের কারণে ধর্মান্তরিত হওয়ার চিত্র আছে। নিঃস্বার্থ এক যোদ্ধার দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বিবেকের প্রত্যয়-প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলোর বিষয়-বিশ্লেষণ কালে আমরা দেখেছি তাঁর কোন গল্পে সম্মুখ সমরের চিত্র নেই, অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই, অশ্রু ও রক্তের প্লাবন নেই। আছে স্থির প্রত্যয়, আছে অমিত সাহস ও সঞ্জীবনী শক্তি যা হানাদারদের উদ্যত অস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড় করানোর শক্তি যোগায়। মাথা উঁচু করে যখন দাঁড়িয়ে থাকে একজন নিপীড়িত মানুষ তখন বাঙালি জাতির সম্মিলিত চৈতন্যের জাগরণকেই প্রতিমায়িত করে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা-৩৬০

যুদ্ধে সব হারিয়েও তেজি তরুণ যখন উচ্চারণ করে একটা স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি সামান্য তখন মনে হয় হুমায়ূন আহমেদ নির্বেদ নিরানন্দের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাননি। 'নিখিল নাস্তির' পরিবর্তে নিখিল আস্তিকতাকেই স্পর্শ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদের গল্পে শুধু পাক আর্মির নিধনের চিত্রই রূপায়িত হয়নি। 'মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত পাত্র-পাত্রীর জীবনের অতুল্য ত্যাগ আর অকল্পনীয় বঞ্চনার অন্তরঙ্গ কথামালা'[১] নির্মাণ করে সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ।

[১]. সরদার আবদুস সাত্তার, হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা, ডিসেম্বর, ১৯৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত-জীবন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন

দীর্ঘদিনের মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহ্যকে ধারণ করে ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর ঢাকার নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় জমালেন। রাজনৈতিক নানাবিধ ঘটনা প্রবাহে ঢাকা হয়ে উঠল প্রাণচঞ্চল নগরী। নতুন নতুন মানুষের ভিড়ে ঢাকা শহর ক্রমাগত প্রসারিত হতে লাগল। ষাটের দশকের উত্তাল সময় ঢাকাকে করে তুলেছে আরো গুরুত্বপূর্ণ। তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম কী শহর সর্বত্রই জীবনের গতি হলো এলোমেলো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নগর জীবনে উচ্চবিত্তের সংখ্যা কমই ছিল বলা যায়। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা ছিল বেশি। উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত – এই তিন শ্রেণিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভাগ করা যায়। হুমায়ূন আহমেদের বেশির ভাগ গল্পে আছে নিম্নমধ্যবিত্ত মানবজীবনের আলেখ্য। শিক্ষিত বেকার, সামান্য চাকুরিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, অফিসের কেরানি, ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি চরিত্র তাঁর গল্পের কুশীলব।

গ্রামীণ ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দু'একটি চরিত্রও হুমায়ূন আহমেদের গল্পে ওঠে এসেছে। তবে হুমায়ূনের গল্পের অধিকাংশই নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির।

উচ্চমধ্যবিত্তের জীবনাচরণ আছে 'একজন সুখী মানুষ', 'কল্যাণীয়াসু', 'একজন ক্রীতদাস', 'অয়োময়', 'অপেক্ষা', 'ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য,' 'প্রেসক্রিপশন', 'সালাম সাহেবের পাপ', 'আলাউদ্দিনের ফাঁসি', 'জলকন্যা'– প্রভৃতি গল্পে।

হুমায়ূন আহমেদ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ বর্ণনার চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের মনোজগতের স্বরূপ সন্ধানে। এঁরা কখনো অত্যন্ত ভালো, কেউ বা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আবার কেউ রহস্যময়তায় নিমগ্ন। এঁদের অনেকেই আত্ম-অনুসন্ধানী মানবিক চেতনায় ঋদ্ধ। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এঁদের চরিত্রে তেমনটি নেই। অন্যের জীবনের বিকাশকে এঁরা রুদ্ধ করেননি। তবে কারো কারো চরিত্রে আছে খেয়ালিপনা। এই খেয়ালিপনায় অবশ্য জগৎ ও জীবনের বড়ো কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। 'একজন সুখী মানুষ' গল্পে উচ্চবিত্তের সুখের স্বরূপ অনুসন্ধানের জটিল জিজ্ঞাসা বর্ণিত হয়েছে। জাকের সাহেবের সন্তানদের সবাই বাস করে বিদেশে। বাবাকে নিয়ে সন্তানদের উদ্বিগ্নতার শেষ নেই। শেভ করতে গিয়ে সামান্য গাল কেটে যাওয়ায় ক্রমাগত সন্তানরা ফোন করতে থাকে। নিঃসঙ্গ জাকের সাহেবের কাছে এগুলো উপদ্রবই মনে হয়। 'জলকন্যা' গল্পে উচ্চবিত্তের বিকৃত রুচির আমোদচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

'সৌরভ' গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের চাওয়া-পাওয়ার গল্পের সাথে একীভূত হয়েছে পারিবারিক বন্ধনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আজাহার খাঁ সামান্য বেতনে চাকরি করেন। ছেলেমেয়েদের সামান্য আবদারও অনেক সময় পূরণ করতে পারেন না। তার বড় মেয়ে লিলি অনেক দিন থেকেই

'ইভিনিং ইন প্যারিস' নামে একটি সেন্ট আনার জন্য আবদার করছিল। কিন্তু সাড়ে ছাব্বিশ টাকা দামের ঐ বস্তুটি কেনার সামর্থ্য হয়ে ওঠে না বাবার। একদিন সকালে লিলি পুরনো কথাটাই আবার উচ্চারণ করে – 'বাবা আজ কিন্তু মনে করে আনবে।'

আজহার খাঁ ধমক দিতে গিয়েও নিজেকে সংযত করলেন। তিনি সন্তানের বিবেচনাহীন কথা শুনে অবাকই হলেন-

> প্রতিটি ছেলেমেয়ে এমন উদ্ধত হয়েছে। বাবার প্রতি কিছুমাত্র মমতা নেই। আর নেই বলেই মাসের ছাব্বিশ তারিখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে পারে,–না আজই আনতে হবে।[১]

আজহার খাঁ প্রচণ্ড হতাশ হলেও ভালোবাসার মতো মহৎ গুণটি তার নষ্ট হয়নি। পরিবারের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা তাঁর রয়েছে। শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র ফুটে ওঠে তার ভাবনায়–

> দশ বছর ধরে আমি এই শহরে পড়ে আছি। দশ বছর খুব দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে আমি রোজ একই রাস্তায় হাঁটছি। একই ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও যাইনি। তোমাদের কথা ভেবে প্রতিটি পয়সা আমাকে সাবধানে খরচ করতে হয়েছে। অফিসে টিফিন আওয়ারে সবাই যখন চায়ের সঙ্গে দুটি করে বিস্কিট খায় আমি সেখানে এক কাপ চা নিয়ে বসি। সেও তোমাদের কথা ভেবেই। তোমরা তার প্রতিদানে কী দিয়েছো আমাকে? আমাকে লজ্জা দেবার জন্য লিলি, তুমি তোমার জমানো টাকা বের করে আন। তোমার মা তার ভাইদের কাছে টাকা চেয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লেখে।[২]

আজহার খাঁর মনে হলো তিনি কুকুরের মতো জীবন যাপন করছেন; সাধ, আহ্লাদহীন বিরক্তিকর জীবন। এসব অসংলগ্ন কথা ভাবতে ভাবতে তিনি মেয়ের দেওয়া তিনটি দশ টাকার নোট পকেটে নিয়ে একটি স্টেশনারী দোকানে ঢুকে পড়লেন। 'ইভিনিং ইন প্যারিস' নেই। দোকানে দোকানে খুঁজতে লাগলেন। বৃষ্টি শুরু হলো। তিন, চারটি দোকান ঘুরতে ঘুরতেই কাদায় পানিতে মাখামাখি। তিনি উদভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি করতে লাগলেন। মনে হচ্ছে সেন্টের শিশিটি তাঁর এই মুহূর্তেই প্রয়োজন।

লিলির জমানো টাকা বাবাকে দেওয়া, নিজের অসহায়ত্ব, হতাশা ও গ্লানি আজহার খাঁকে যেন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অবশেষে পাওয়া গেল 'ইভিনিং ইন প্যারিস'। দরদাম করার ধৈর্য নেই আর। টাকার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে আজহার খাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পকেটে একটি দুই টাকার নোট আর একটি আধুলি ছাড়া কিছুই নেই!

আজহার খাঁ ভাবলেশহীন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়লেন। এ পর্যায়ে আজহার খাঁ যেন ভারসাম্যহীন হয়ে গেলেন। পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। পা টলছে, মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। মেয়ের কথাও ভাবছেন তিনি –

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪২৩।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪২৪

আহা, আমার মেয়ে শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে। আশা করে বসে আছে হয়তো। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার ! বাবার সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছে ! তার নিজের সংসার হোক, সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।[১]

প্রবল জ্বর নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে রফিক নামের একজনের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ঋণ নিয়ে রাত সাড়ে বারোটার দিকে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে 'ইভিনিং ইন প্যারিস' সহ বাসায় ফিরছেন আজহার খাঁ। ঝড় - বৃষ্টির কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। হারিকেন হাতে লিলি ও তার মা অপেক্ষা করছে তার জন্য বাড়ির সামনের রাস্তায়। অবসন্ন আজহার খাঁ ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামতেই উলটে পড়লেন। যেখানে পড়লেন সেখানে মিষ্টি সুবাস– 'ইভিনিং ইন প্যারিসের'। তিনি ধরা গলায় বললেন – 'লিলি তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে।' লিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল - 'আমার শিশি লাগবে না। তোমার কী হয়েছে বাবা?'

গল্পটির সমাপ্তি ব্যঞ্জনাময়। সেন্টের শিশি ভেঙে যে সৌরভ ছড়িয়েছে তা মূলত পারিবারিক বন্ধন আর ভালোবাসার সৌরভ। লিলির তুচ্ছ আবদারের চেয়ে বাবার প্রতি মমতা-ভালোবাসাই হয়ে উঠেছে প্রধান। তার হৃদয়ের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে। ইভিনিং ইন প্যারিসের আর প্রয়োজন নেই। হৃদয়ের সৌরভের কাছে পৃথিবীর যাবতীয় সৌরভই হয়ে যায় ম্লান ।

নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনঘেঁষা গল্প 'ফেরা'। জীবনের জটিল কোন তত্ত্ব এ গল্পে নেই। তবু মনে হয় জীবনের গূঢ়ার্থ লুকিয়ে থাকে সরল স্বাচ্ছন্দের মধ্যেই। সামান্য প্রাপ্তি যখন প্রাণে স্পন্দন যোগায় তখন তত্ত্ববহুল জীবনের হিসেব নতুন করে করতে হয়।

তিনজন ছেলেমেয়ে নিয়ে পাঁচজনের সংসার জরীদের। বড় মেয়ে জরী যেন একটু অভিমানী। অভাবের সংসার। প্রতিদিন ভালো খাবার জোটে না। এখানে বলে রাখা ভালো 'ভালো খাবার' বলতে ডিমও বুঝায়। ছেলেমেয়েদের অভাব-অভিযোগ-আবদারের অধিকাংশই মোকাবেলা করতে হয় গৃহকর্মী হাসিনাকে। আবদার তেমন কিছু নয়। খাবারে একটু বৈচিত্র্য। ঈদে একটি জামা। অল্প বেতনের চাকুরে জরীর বাবার পক্ষে সন্তানদের এই আবদার পূরণ করাও সাধ্যে কুলোয় না। ফলে হাসিনাকে দ্বারস্থ হতে হয় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বড় ভাইদের। অভাবী সংসারে নানা রকম অপ্রাপ্তি আছে তবু সামান্য আয়োজনেই পরিবারে নেমে আসে প্রশান্তি।

সেদিন সন্ধ্যায় 'রোজ রোজ একই খাবার' বলে প্রায় না খেয়েই রাগ করে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে। জরীর বাবা ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরেন বড়সড় একটি রুই মাছ নিয়ে। জরীর বাবা হঠাৎ আয়োজনের কারণ ব্যাখ্যা করেন –

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪২৫।

আজ থেকে আমার বেতন চল্লিশ টাকা বেড়েছে। তোল তোল সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোল।[১]

আবার ভাত রান্না হলো, মাছ ভাজা হলো। সকলে এক সাথে খাওয়া শেষ করলো। আনন্দের যেন শেষ নেই –

রাত বাড়তেই থাকল। খাওয়া-দাওয়া অনেক আগেই সারা হয়েছে তবু ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘিরে বসে রয়েছে। সামান্য সব কথায় হা হা করে হেসে উঠছে।[২]

নিম্নমধ্যবিত্ত এসব পরিবারের জীবনের হিসাব অত্যন্ত সরল। সচ্ছলতার মাঝেই বেঁচে থাকার অপার আনন্দ খুঁজে মধ্যবিত্ত জীবন।

এক হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক প্রণব বাবু। তিনি বিপত্নীক। এক মেয়ে ও এক ছেলের পিতা তিনি। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তবে তিনি বিয়ে দেননি । এলাকার বিত্তশালী কেদারনাথ বাবু কলকাতায় নিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটি ময়মনসিংহ শহরে মোটর মেকানিকের কাজ করে। একবার চুরির মামলায় ধরাও পড়েছিল। মেয়েটির তেমন কোনো খোঁজ তিনি জানেন না। একবার শুধু এক হাজার টাকা চেয়ে মেয়েটি দীর্ঘ এক চিঠি লিখেছিল। তিনি টাকা দিতে পারেননি। ছেলেটি মাঝে মাঝে আসে। তবে তিনি তেমন কথাবার্তা বলেন না। গণিতের কত জটিল বিষয় তিনি সহজেই মিলিয়ে ফেলেন। কিন্তু জীবনের হিসাব তিনি মেলাতে পারেননি।

নিম্নমধ্যবিত্ত এক পিতার অসহায়ত্বের গল্প 'জুয়া'। সেদিন স্কুলের হেডমাস্টারের 'দেশ হিতৈষিমূলক' কাজের প্রতি সমর্থন করতে বাধ্য হয়েই প্রণব বাবু পাঁচটি টিকিট কিনলেন। রেডক্রস লটারির দুই টাকা দামের টিকিট প্রতিটি। প্রতি দশটি টিকিটে হেডমাস্টার সাহেবের দুটাকা করে লাভ থাকে। তাই তিনি দেশের কাজে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিন মাস ধরে যাদের বেতন বন্ধ তাদেরও ' দেশের কাজে' পাঁচটি করে টিকিট কিনতে হলো।
লটারির রেজাল্ট বের হলে দেখা গেলো প্রণব বাবু দুই লক্ষ টাকা জিতেছেন। তারপর সেদিনের টিফিনে 'মুড়ি বন্টন' জমলো না। টিফিনের পর কোনো ক্লাস নিতে অন্যান্য শিক্ষক আর আগ্রহবোধ করলেন না। স্কুল ছুটি হয়ে গেলো। হেডমাস্টার সাহেব অকারণ ছুটির জন্য চেচাঁমেচি শুরু করলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার জবাব দিলেন –

কী ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন? কে গিয়ে এখন ক্লাস নেবে? তিন মাস বেতন নাই। এর মধ্যে একজন দু'লাখ টাকা পেলে মেজাজ ঠিক থাকে?[৩]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১২৯।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৩০।

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫৮।

সেদিন রাতে প্রণব বাবু রুটি গরম করছিলেন। এমন সময় সুবল এসে হাজির। আজ প্রণব বাবুই জিজ্ঞেস করলেন ছেলের কুশলাদি। পিতা-পুত্রে কিছু কথা হলো। প্রণব বাবুর মনে পড়তে লাগলো মেয়ের চিঠির কথা। টাকার অভাবে মেয়েকে নিজে বিয়ে না দিতে পারার কথা। ছেলের অন্যরকম জীবন যাপন করার কথা। সুবল সেদিনও কিছু টাকা চাইলো। প্রণব বাবুর চোখে জল দেখে সুবল বললো যে তার বাবা যেন চিন্তা না করেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। দুলাখ টাকার টিকিট পকেটে নিয়ে প্রণব বাবু ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন আর বললেন – 'কিছুই ঠিক হয় না।' লটারির জুয়ায় প্রণব বাবু জিতেছেন ঠিকই কিন্তু জীবনের কাছে বার বার হেরে গেছেন এই টাকার জন্যেই। জুয়ায় তিনি জিতেছেন তবে তা বড্ড অসময়ে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দুই ভাই-বোনের নিদারুণ কষ্টগাথা 'জীবন যাপন।' গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। বিনু নামের বিবাহিত এক মেয়ের ছোট ভাই গল্পটি বলছে। যার সাথে বিনুর বিয়ে হয়েছে সেই লোকটি বিনুর ছোট ভাইয়ের কাছে 'খবিশ' ধরনের। লোকটির বয়স বিনুর বয়সের প্রায় দুই গুণ। মাথায় কলপ দেয় নিয়মিত; কৃপণ এবং চরিত্রহীন। কিন্তু বিনুটা খুবই বোকা ধরনের এবং এরকম স্বামীর কাছে থাকতে পেরেও তার আদিখ্যেতার সীমা নেই। স্বামীর প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ– একটু বয়স না হলে বরদের তার ভালো লাগে না। চেংড়া জামাই তার কাছে অসহ্য।

বিনুর স্বামী তার ভাইকে তাদের বাড়িতে থেকে যেতে বলল। বিনুর খুশির সীমা নেই। তার ভাইও মন্দের ভালো ভেবে থেকে যেতে বাধ্য হলো। এর কারণ গল্পকথকের বর্ণনায় পাওয়া যায় –

> বাবার মৃত্যুর পর আমরা চার ভাই বোন এবং মা গভীর সমুদ্রে পড়ে যাই। আমাদের সবাইকে ভাগাভাগি করে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের ঘাড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করে আমাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে। পারে না। কারণ আমরা আঠার মতো লেগে থাকি।[১]

বিনুর স্বামীর মতলবটা দ্বিতীয় দিনে বুঝে ফেলল তার ভাই। এ বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই। ফলে বাজার করার দায়িত্ব এবং আরো টুকিটাকি কাজের সুবিধার জন্যেই অসম্ভব কৃপণ এই মানুষটি তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির রাতে সিগারেট আনা, এটা ওটা করাসহ নানান কাজে বিনুর ভাইটিকে সে ব্যবহার করে। লোকটি যে চরিত্রহীন তা বিনুর ভাই বুঝতে পারে বাড়ির কাজের মহিলা ময়নার মা আর তার নানা ভাব-ভঙ্গিমায়। একসময় সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করলে তারা বাসা বদলে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু বিনু কিছুই বুঝতে পারে না।

বিনুকে মাঝে মাঝেই শারীরিক নির্যাতন করে লোকটি। পাশের ঘর থেকে সবই শুনতো তার ভাই। মেয়েটি বোকা বলে অল্প সময়ের মধ্যেই সব মিটমাট হয়ে যেতো। মিটমাট না করে উপায় কী। বিনুর কি যাবার জায়গা আছে? আর তার ভাইয়ের ? গভীর রাতে বিনু এসে লজ্জিত কণ্ঠে ভাইকে বলে– 'তোর দুলাভাইকে একটা সিগারেট এনে দে না।'

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৬৪।

শ্রাবণ মাসের আকাশে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে যেতে হয় ছেলেটিকে সিগারেট আনার জন্যে। মাঝে মাঝে এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে জাগে। কিন্তু যাবে কোথায়? জায়গা কি আছে যাবার মতো। ফিরে আসে সে। বিনু জিজ্ঞেস করে– 'সিগারেট ভিজে যায়নি তো'? না । সিগারেট ভিজে যায়নি, তার ভাই ভিজে গেছে। পিতৃহীন দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবন যাপন চলতে থাকে পরগাছার মতো। ক্লেদাক্ত এ জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচার বোধ জন্মে, কিন্তু উত্তরণের উপায় নেই।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী' নামক একটি কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'আনন্দ-বেদনার কাব্য'। গল্পটি বলার ধরনে যথেষ্ট শৈল্পিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পকথক কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকা পড়েই একটি গল্প দাঁড় করিয়েছেন। কবির ভাষণ এবং কথকের কল্পনার মিশেলে নির্মিত হয়েছে চমৎকার এ গল্পটি।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী' কাব্যের কবির বড় মেয়ে মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম (বেনু), দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ– গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পী। প্রকাশের দিন থেকে পাঁচ বছর পূর্বে কাব্যটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশের সময় প্রচ্ছদ শিল্পী অর্থাৎ কবির মেয়ে গ্রন্থটি দেখে যেতে পারেনি। ভূমিকাংশে পাওয়া এ সংবাদটির কারণেই গল্পকথক পুরো বইটি পড়ে ফেললেন অপার আগ্রহ নিয়ে এবং ভাবকল্পনায় নির্মাণ করলেন আনন্দ-বেদনার গল্পটি।

গল্প কথক বলেছেন–

> মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাৎ করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি নিয়ে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলাম।[১]

গল্প কথকের কল্পনায় আর ভূমিকাংশের বর্ণনায় জানা গেল বহু কষ্টে 'রিক্তশ্রী পৃথিবী' বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নতুন লেখক সম্পর্কে বাস্তব কিছু মন্তব্যও পাওয়া গেল কথকের কল্পনায়। কবি হয়তো কোনো প্রকাশকের কাছে গিয়েছেন পাণ্ডুলিপি নিয়ে। প্রকাশক বলে ফেলল–

> এ সব কাব্যের বই কি আজকাল চলে রে ভাই? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। টাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপেন।[২]

গল্প কথকের কল্পনা আরও এগিয়ে গেল। দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগলো টাকা যোগাড় করতে। স্ত্রীর কানের দুলজোড়া হয়তো বিক্রি করতে হলো। সে বছর ঈদে বাচ্চারা হয়তো কোনো কাপড় নিলো না। সস্তা মানের একটি প্রেসে ছাপা হলো 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'।

শেষ সম্বল দিয়ে নির্মাণ করা হলো একটি শিল্প। কেনা হলো কবির সুখ – একটি পরিবারের ক্ষণিকের আনন্দ। 'রিক্তশ্রী পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে একশো তেরোটি। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ, সময় ও প্রয়োজনীয় ফুট নোট দেওয়া আছে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৭৪।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৭৪।

'বাসর শয্যা' নামক কবিতার ফুটনোটে লেখা -

> এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসর রাতে রচনা করিয়াছি। সেই সময়ে বাহিরে খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষন। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমার নবপরিনীতা বালিকা-বধূ মেঘ গর্জনে বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছিল।[১]

এ ফুটনোট অবলম্বনে কথকের কাল্পনিক অথচ বাস্তব গল্পাংশটি এরকম :

> যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছ' পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখতে পারে, সে পরবর্তী সময়ে কী পরিমাণ বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছে তার স্ত্রীর মনে। ঘরে টাকা-পয়সা নেই। ছোট ছেলের জ্বর। তার জন্যে সাগু কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। গভীর ভাবাবেগে তাঁর চোখে জল। লিখেছেন 'একদা জ্যোৎস্নায়' নামের দীর্ঘ কবিতা। কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয়?[২]

এসব নিশি-পাওয়া মানুষদের বাস্তব জগতটি হয় খুবই সংকীর্ণ। ঈশ্বর এদের আবেগে উদ্বেলিত হওয়ার মতো একটি হৃদয় দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেই আবেগকে প্রশমিত করার মতো ক্ষমতা দেননি। কাব্য গ্রন্থের শেষ কবিতাটির নাম 'মাগো'। প্রচ্ছদ শিল্পী নুরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। অন্যান্য কবিতার মতো এটিও কাঁচা হাতের লেখা। তবু কথকের বর্ণনায়–

> প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধ করি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে।[৩]

একটি মাত্র কবিতা লিখেও কেউ কেউ কবি হয়ে যেতে পারে। অল্প পঙক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে জীবনের মহান বোধ, মহৎ আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সুতরাং 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র গ্রন্থকার একজন কবি।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র কোনো কবিতা হয়তো কোনো মহত্ত্বের বোধ তৈরি করবে না। জগতকে এ পাল্টে দিতে পারবে না। তবু এই কাব্যগ্রন্থটি ঘিরে দরিদ্র একটি পরিবারে একদিনের জন্যও আনন্দের যে বন্যা বয়ে গিয়েছিল তাও কম নয় :

> কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিশ্চয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অবিক্রিত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাণে ধরে সের দরে বিক্রি করতে পারবে না।[৪]

গল্পটিতে শিল্পমনা প্রান্তিক মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য এবং শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগের দিকটি নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৭৫।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৭৫-৩৭৬।

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৭৭।

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৭৬

জোবেদ আলী নামের এক নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের গল্প 'কবি'। জোবেদ আলীর কাজ প্রেসে প্রুফ দেখা। বিপত্নীক এই মানুষটির আছে একটি মেয়ে এবং একটি শিল্পীমন। জোবেদ আলী কবিতা লেখেন। এই গল্পে দুটি বিপ্রতীপ চরিত্র দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। টাউন প্রেসের মালিক সিরাজুল ইসলাম। জোবেদ আলী তার প্রেসের কর্মচারী। বৃষ্টি জোবেদ আলীর মনে কবিত্ব সৃষ্টি করে। সিরাজুল ইসলাম ঝড়-বৃষ্টি পছন্দ করেন না। বিশেষ করে সেদিন বিন্তি নামের মেয়েটির কাছে তার যাওয়ার কথা। 'একটি কালো মায়াবতী যুবতীর জন্যে তার এক ধরনের ক্ষুধা বোধ হয়'। তার স্ত্রীর গায়ের রং এতটাই ফর্সা যে তাকে দেখতে শ্বেতী রোগীর মতো লাগে। বৃষ্টি বাড়তে থাকে। সিরাজুল ইসলামের মন হয় অপ্রসন্ন। অন্যদিকে জোবেদ আলী ঝরঝর বৃষ্টির রাতে খাতা নিয়ে বসলেন।

জোবেদ আলীর মেয়েটির জ্বর। সে দুধ-কলা দিয়ে ভাত খেতে চেয়েছিল। রাত বেশি হওয়ায় কলা পাননি জোবেদ আলী। মেয়েটি শুয়ে শুয়ে তার বাবাকে দেখছে। তার কবি বাবা লিখছে আর তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। মেয়েটি প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন। সে ডাকল – 'বাবা।' চরম দারিদ্র্যের মাঝেও শিল্পের সাধনা জোবেদ আলীকে অনন্য করে তুলেছে। মেয়েটির ডাক তার কবি বাবা শুনতে না পেলেও পাঠক ঠিকই শুনেছে। বাৎসল্যপ্রীতির অনন্য গল্প 'কবি'।

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সিনেমেটিক গল্প 'প্রেসক্রিপশন'। হুমায়ূন আহমেদের বাবা চরিত্রগুলো হয় অসাধারণ। তেমনি অসাধারণ এক বাবার গল্প আছে 'প্রেসক্রিপশন' গল্পে। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষ সানোয়ার সাহেব। ওষুধের ব্যবসা করে জীবনের চাকা ঘুরিয়েছেন তিনি। তার ফার্মেসি 'প্রেসক্রিপশনে' গল্প কথকের পরিচয় ও সময় কাটানো। ছেলের মুখে বাবার গল্পটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। সানোয়ার সাহেবের বাবা ছিলেন সুদর্শন। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন ছিল তার। থাকতেন এক চাচার বাড়িতে। চাচাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের মোটামুটি একটি পরিকল্পনা ছিল ঐ চাচার। কিন্তু সানোয়ার সাহেবের বাবা বিয়ে করেন সিনেমার একজন এক্সট্রাকে। ফলে সহায়সম্বলহীন এই মানুষটি পড়ে যান আরো বিপাকে। তার জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। এমন অবস্থায় ছেলে সানোয়ারের জন্ম। কোনো কর্ম নেই বাবার। এফডিসি-তে যান তিনি। মাঝে মধ্যে দু-চারটি নিম্নশ্রেণির কাজ করেন। কিন্তু তা দিয়ে সংসার চলে না। এমন সময় সানোয়ার সাহেবও প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সানোয়ারের বাবার যখন দুঃসময় তখনই এফডিসি-তে খুন হলো একজন। তার বাবা আয়ের একটা পথ পেয়ে গেলেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে খুনের মামলার দায় নিলেন। সন্তানের জন্য রেখে গেলেন চার লাখ দশ হাজার টাকা।

সানোয়ার সাহেবের বাবার ফাঁসি হওয়ার পর তার মা সিনেমার এক প্রডিউসারকে বিয়ে করেন। এই প্রডিউসারই তিনি, তার অপরাধ বিক্রি করেছিলেন সানোয়ারের বাবার কাছে। ছেলে বাবার স্মৃতি কথা মনে করার চেষ্টা করে বলে –

> বাবার মামলা সাড়ে চার বছর ধরে চলেছে। বাবার যখন ফাঁসি হয় তখন আমার বয়স পাঁচ। ফাঁসির আগে আগে আমাকে কোলে নিয়ে মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বাবা আমাকে অনেক আদর করলেন। বাবার সম্পর্কে আমার কোনো স্মৃতি নেই– শুধু আদরটা মনে আছে।[১]

সানোয়ার সাহেবের বাবা সিনেমার নায়ক হতে পারেননি, তবে ছেলের কাছে তিনি এক মহানায়ক হয়েই থাকবেন চিরকাল।

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ব্যক্তিত্ব, অপরাজেয় শক্তি ও স্পৃহার গল্প 'খেলা'। খায়রুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের থার্ড স্যার বাবু নলিনি রঞ্জন। তাঁর বন্ধু জালাল সাহেবের কাছে দাবা খেলা শিখে ফেললেন তিনি। দাবার নেশা তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন দাবার অপ্রতিরোধ্য চ্যাম্পিয়ন। বাংলাদেশে দাবার চ্যাম্পিয়ন আসাদ খাঁকে পরপর তিনবার পরাজিত করে দাবা জগতের মুকুটহীন সম্রাট হয়ে উঠলেন তিনি। নেয়ামতপুরের গৌরব নলিনি রঞ্জন। নলিনি বাবুর বিদায়ের দিন স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়া একটি ঘোষণা দিলেন যে, যদি কেউ নলিনি বাবুকে দাবা খেলায় হারাতে পারে তবে তাকে পনের হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আর নলিনি বাবুকে হারাতে না পারলে পনের হাজার টাকা থাকবে স্কুল ফান্ডে। আশ্বিনের এক সন্ধ্যায় প্রবল হাঁপানির টান নিয়ে নলিনি বাবু তাঁর জীবনের শেষ খেলাটি খেলতে বসলেন দীর্ঘ দিনের বন্ধু জালাল সাহেবের সাথে। জালাল সাহেব বহু কষ্টে নলিনি বাবুকে রাজি করিয়েছেন এ খেলায় হারার জন্য। কারণ জালাল সাহেব জিতে গেলে পনের হাজার টাকার সবটা দিয়েই নলিনি বাবুর চিকিৎসা হবে। খেলতে খেলতে তিনি যেন বেহুঁশ হয়ে গেলেন এবং–

> জীবনের শেষ খেলাটিতে বহু চেষ্টা করে তিনি হারতে পারলেন না। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় নিয়ামতপুরের গৌরবের মৃত্যু হলো– ১২ নভেম্বর ১৯৭৫ সন। রোজ মঙ্গলবার। খায়রুন্নেসা গার্লস স্কুল সে উপলক্ষে দু'দিন ছুটি থাকল।[২]

খেলাটিতে নলিনি বাবু হেরে গেলে হয়তো তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তাঁর সে বেঁচে থাকাটা কেবলই টিকে থাকা ছাড়া আর কিছু হতো না। একদিকে মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি অপরাজেয় মানসিকতা, অন্যদিকে নলিনি বাবুর প্রবল ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুকে করেছে মহিমান্বিত। ছদ্ম পরাজয়ের চেয়ে অপরাজিত থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াটাই তাঁর কাছে গৌরবের মনে হয়েছে। মানুষের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা নেওয়া নয়। মরণশীল মানুষও অমরত্ব অর্জন করতে চায়। হুমায়ূন আহমেদ অতি সাধারণের মাঝেও নির্মাণ করেন পুরুষোত্তম চরিত্র। নলিনি বাবু আমাদের মনে বেঁচে থাকবেন অপরাজেয় এক বীর হয়ে।

নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অনন্য ছবি আছে 'জলছবি' গল্পে। ফার্মগেটে বাসে ওঠার সময় জলিল সাহেবের বাম পায়ের জুতোর তলা গেল খুলে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৬২৮।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৮৪।

অফিস টাইমে বাসে পা ফেলবার মতোও জায়গা নেই। শাহবাগের কাছে গিয়ে একটি সীট পেয়ে গেলেন তিনি। পাশে বসা লোকটির ঘাড় থেকে কান পর্যন্ত দগদগে ঘা। বাস এগিয়ে চলছে। উৎসুক নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক কিছু ক্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে বাসযাত্রায়। জলিল সাহেবের জুতোটি একজন দেখেই নানা প্রশ্ন জুড়ে দিল। আরো দু-তিনজন এগিয়ে এলো জুতোর খোঁজ নিতে। দুটি মেয়ে সামনের সীট থেকে উঁকি দিচ্ছে জুতো দেখার জন্য। নাগরিক জীবনের হৃদয়হীনতার কয়েকটি চিত্র আছে গল্পটিতে।

জলিল সাহেব প্রেসক্লাবে নেমে জুতোটি ঠিক করিয়ে অফিসে প্রবেশ করলেন দেরি করে। আজ নিয়ে দুদিন দেরি হলো তার। অফিসে গিয়েই বুঝলেন কানাঘুষা চলছে। তাঁর চাকরি মনে হয় চলে গেছে– একথা ভাবতে ভাবতেই বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন তাঁকে। চাকরি যায়নি তাঁর। তাঁর কর্মে খুশি হয়ে হেড অফিস জলিল সাহেবকে প্রমোশন দিয়েছে। জলিল সাহেবের চোখে পানি চলে এলো। তিনি ধরা গলায় বললেন– 'স্যার জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উচাঁ হয়ে আছে। খুব ব্যথা করছে।'

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের কর্মনিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা এবং তারই ফলে প্রাপ্য মণিহার কখনো কখনো মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। উচাঁ পেরেকের প্রতীকী রূপটি হুমায়ূন আহমেদ সযত্নে নির্মাণ করেছেন। নিম্নবিত্ত জীবন যেন খয়ে যাওয়া জুতোর তলা আর পেরেকের মধ্যে আটকে আছে।

গল্পটিতে জলিল সাহেবের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন চিত্র, তার নিঃস্বপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকা এবং নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতার বর্ণনায় নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্রতা ওঠে এসেছে।

নিম্নমধ্যবিত্তের সামবায়িক গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র আছে 'নিশিকাব্য' গল্পে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আনিস শহরে থাকে। ছোট একটি চাকরি করে সে। অফিসে তেমন ছুটি নেই। অফিসের কী একটা কাজে ময়মনসিংহ এসেছিল। একটু অবকাশ পেয়েই বাড়িতে এসেছে দেখা করতে। রাতটুকুই শুধু থাকবে। ভোর রাতেই ট্রেন ধরতে হবে ঢাকার। আনিস বাড়িতে আসার সাথে সাথেই তার মা মরাকান্না জুড়ে দিলেন। কেউ ধমক না দেওয়া পর্যন্ত তার কান্না চলতেই থাকে; এমনই স্বভাব তার। ছোটছেলে আজিজের ধমক খেয়ে তিনি কান্না থামালেন। বাড়িতে যেন আচমকা উৎসব শুরু হলো, যারা ঘুমিয়ে ছিল সবাইকে ডেকে তোলা হলো। গল্প-খাওয়া-দাওয়া চলল প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত। চমৎকার পারিবারিক আবহে অল্প সময়েই কত কথা হলো সকলের। এবার আনিসকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে সবাই যার যার ঘরে চলে গেল। আনিসের স্ত্রীর নাম পরী। একটি সন্তান আছে তাদের। পরীর জন্য আনিস একটি শাড়ি এনেছে। পরী সেই শাড়ি নিজের জন্য না রেখে ননদ রুনুর জন্য রেখে দিল। সেদিন রাতে সে পরল তার বিয়ের শাড়িটি। আর সময় নেই আনিসের। এবার যাওয়ার পালা। ছোটবোন ঝুমুকে টেনে তোলা হল ঘুম থেকে

আবার। সে ভাবীর গায়ে বিয়ের শাড়ি দেখে বলে ফেলল – 'ভাবী আজ বিয়ের শাড়ি পরেছো কেন?' এ প্রশ্নের লজ্জা থেকে বাঁচাতে প্রকৃতি এলো পরীর বন্ধু হয়ে–

> মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী আকাশের চাঁদ। পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোৎস্না লুকিয়ে ফেলল।[১]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে জটিলতা নেই। তবে সরল ঘটনাগুলোকে তিনি প্রকাশ করেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারটির জীবনগাথা পড়লে তাই পাঠকের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক গল্প 'অন্তরার বাবা'। প্রাইভেট ব্যাংকে ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগে কাজ করা মফিজউদ্দিন সাহেব নির্বিরোধ মানুষ। অফিস থেকে বাসায় ফিরে সন্ধ্যার পর তার একমাত্র কাজ নাটক-সিনেমা দেখা। ঘরে বসে টিভিতে তিনি পুরনো হিন্দি ছবি দেখেন। তার স্ত্রীও শান্ত স্বভাবের। সুখী দাম্পত্যজীবন তাদের। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছোট মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ঝামেলাহীন ছোট সংসার মফিজউদ্দিনের। তার স্ত্রীর ভাষায় মফিজউদ্দিনের স্বভাব মোটামুটি নিম্নরূপ :

> সে আছে নিজের মতো, মাস শেষে বেতনের টাকাটা তুলে দিলেই যেন সব দায়িত্ব শেষ। এ রকম মানুষের আসলে সংসার করাই ঠিক না। এরা আসলে মানুষও না, ঘরের আসবাব। সংসারে এদের ভূমিকা ফার্নিচারের মতো। জায়গামতো ফার্নিচারটা বসিয়ে দাও। মাঝেমধ্যে ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ধুলা উড়িয়ে দাও-সব ঠিক।[২]

এমন গোবেচারা মানুষ মফিজউদ্দিন সাহেব একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে একটি কাফনের কাপড় নিয়ে বাসায় ফিরলেন। বিষয়টি নিয়ে তার ছোট মেয়ে কিছুটা রসিকতা করলেও তার স্ত্রী খুব রেগে যান। কাফনের কাপড় ফেরত দিতে নির্দেশ দেন তিনি। রাতে দেখা গেল মফিজউদ্দিন সাহেব কাফনের কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে টিভি দেখছেন। অন্তরা এ দৃশ্য দেখেই চিৎকার করে বাড়ি কাঁপিয়ে তোলে। এখানেই গল্পটি শেষ হলো। মৃত্যুচিন্তা প্রায় সকল মানুষকেই তাড়িত করে। একেক মানুষের মৃত্যুচিন্তার ধরন একেক রকম। মৃত্যু মানুষের অনিবার্য সত্য। তবু বেঁচে থাকতে মৃত্যুর আয়োজন মানুষ করতে চায় না।

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের রহস্যঘেরা ছোট গল্প 'গন্ধ'। গল্পটি সম্পর্কে লেখকের ভূমিকা– 'গন্ধ' গল্পটি এক বৈঠকে লেখা। আমার পছন্দের গল্প। আমার ধারণা এই সংকলনের সবচেয়ে ভালো গল্প।' গল্পটির শুরু ও শেষ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। তবে চরিত্রের বিক্ষিপ্ত ভাবনায় চরিত্রেরা বিচরণ করে নেত্রকোণা, বিচারিক আদালত, ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল পর্যন্ত। গল্পের নায়ক আব্দুল করিম নব বিবাহিত। তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। বৃহস্পতিবার শেষ রাতে তার ফাঁসি কার্যকর করা হবে। জেলার এসে তার সাথে নিয়মতান্ত্রিক বাক্য বিনিময় করলেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৩৬।

[২].প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৬৩৫।

সে কী খেতে চায় জেনে নিলেন। রাত নয়টায় ডিমওয়ালা শিং মাছের ঝোলসহ ভাত চলে এলো। জেলার সাহেব আব্দুল করিমকে আঠারোটি সিগারেট দিলেন। সে ভাত খেয়ে গার্ডের এনে দেওয়া পান খেল। জেলার সাহেবের দেওয়া সিগারেট ধরাল। আব্দুল করিমের স্মৃতিতে ভেসে উঠল তাদের বিয়ের দিনের কথা। যমুনা নামের মেয়েটির সাথে মধুর দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি খণ্ড খণ্ড চিত্র তার খুব মনে পড়ল। কিছু জিজ্ঞেস করলে যমুনা সুন্দর করে বলতো– 'বলব না'। বছর খানেক আগে যমুনাকে নিয়ে সে এসেছিল ঢাকায়। আব্দুল করিম ছোট একটি চাকরি করতো। একদিন অফিসে যাওয়ার পরপরই যমুনা টেলিফোন করে তাকে বাসায় আসতে বলে। কারণ জিজ্ঞেস করায় যমুনা সে দিনও বলেছিল– 'বলব না'। আব্দুল করিম বাসায় এসে দেখে যমুনার মৃতদেহ পড়ে আছে খাটের ওপর; মুখে রক্ত। সে উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। কমলাপুর থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলো। আদালতে তার বিচার হলো। তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে ফুলি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। আদালতে প্রমাণিত হলো ফুলির সঙ্গে গোপন সম্পর্ক থাকায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যমুনাকে হত্যা করে করিম।

অথচ ফুলিকে আব্দুল করিম মা সম্বোধন করতো। কেন সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো তা আব্দুল করিমের কাছে রহস্যজনকই মনে হলো। তবে সে রহস্যের জট খুলে গেলো সহজেই। আব্দুল করিম জানতে চাইলো তার ফাঁসিটি কার্যকর করবে কোন লোক। রমজান মিয়া নামের এক পুরনো কয়েদি তার ফাঁসি কার্যকর করবে। রমজান মিয়া আব্দুল করিমকে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় আব্দুল করিম বিড়ির গন্ধ পেল। তার মনে পড়ল সে যে বাসায় ভাড়া থাকতো সে বাসার দারোয়ানের নামও রমজান মিয়া। অদ্ভুত কায়দায় সে হাতের ফাঁকে বিড়ি লুকাতে পারতো। রমজান এমনিতে দেখা হলেই আব্দুল করিমের সাথে এটা-ওটা অনেক কথা বলতো। কিন্তু যমুনা যেদিন খুন হলো সেদিন আব্দুল করিমকে দেখে সে একটি কথাও বলেনি। তাকে দেখাচ্ছিল কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। যমুনা একদিন বলেছিল যে, ফুলিকে সে রাখবে না। সে রমজানের সাথে প্রায়ই গল্প করতে চায়। আজ আব্দুল করিম বিড়ির যে গন্ধ পাচ্ছে যমুনার শরীরে সেদিনও এরকম গন্ধই পেয়েছিল। আব্দুল করিম স্ত্রী-হত্যার রহস্যটি উন্মোচন করার সাথে সাথেই জেলার সাহেব ইশারায় ফাঁসি কার্যকরের সিগনাল দিলেন। মানব জীবন এক জটিল ভ্রমের জাল। এ জালে কে যে কখন আটকা পড়ে তার কোন নির্দিষ্টতা নেই। নিয়তিতাড়িত মানুষের জীবনসঙ্কট নৈপুণ্যের সাথে এ গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়– মধ্যবিত্ত জীবন বর্ণনায় হুমায়ূন আহমেদ কোন ভণিতা করেননি। জীবনের প্রাত্যহিকতা বর্ণনার চেয়ে লেখকের দৃষ্টি চরিত্রের মানস-সন্ধানে। মনোজগতের অতলে হাতড়ে বেড়িয়েছেন তিনি। জীবনের প্রতি চরিত্রগুলোর ইতিবাচকতা আছে। মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের মিলনসেতু নির্মাণ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। জীবনের ক্লেদাক্ত দিকগুলো তিনি সজ্ঞানে উপেক্ষা করেছেন। গল্পগুলোয় বাৎসল্যপ্রীতি অন্যতম উপজীব্য। স্বাধীনতা পরবর্তী নাগরিক মধ্যবিত্তের নিপুণ কারিগর হুমায়ূন আহমেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নিম্নবিত্ত-জীবন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হুমায়ূন আহমেদের গল্পে নিম্নবিত্ত-জীবন

সমাজে যারা বাস করে নানামাত্রিক ক্ষমতা, মর্যাদা ও শক্তির বিপ্রতীপ প্রান্তে তারাই নিম্নবর্গ হিসেবে পরিচিত। যাদের কেউ নেই, যাদের কিছুই নেই; তাদেরই অবস্থান সমাজের প্রান্তসীমায়। এরাই প্রান্তজন। জীবন যাদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট, সর্বসহায়হারা উন্মূলিত জনগোষ্ঠী যারা, তারাই নিম্নবিত্ত। জীবন যাপনে এ সকল মানুষ ক্লান্তপ্রায়। জীবনযুদ্ধে এরা নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, ব্যথিত ও বঞ্চিত।

নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থানগত স্বরূপ নিম্নরূপ :

ক. সামাজিক পদমর্যাদায় নিচু বা সাধারণ স্তরের মানুষ।
খ. পেশা, পদ, পদবিগত দিক থেকে অধস্তন জনগোষ্ঠী।
গ. কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে গৌণ জনগোষ্ঠী।
ঘ. পুরুষতান্ত্রিকতার দাপটে ক্ষত-বিক্ষত অধস্তন নারীগোষ্ঠী।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ছোটগল্পে গ্রামীণ প্রান্তবাসী মানুষকে যেমন তুলে এনেছেন তেমনি শহুরে সর্বসহায়হারা ব্রাত্য-মানুষদেরকেও তুলে এনেছেন। অশিক্ষিত, উৎকেন্দ্রিক, শ্রমজীবী এসব মানুষ বাস করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, শহরের বস্তিতে। হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত দরদ দিয়ে এসকল প্রান্তিক মানুষের জীবনকে গল্পের উপজীব্য করে তুলেছেন।

গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে হুমায়ূনের গল্পে এসেছে নদী-তীরবর্তী অসহায় মানুষ, খেয়ালি কর্মহীন মানুষ, বক-শিকারি, দিনমজুর, দরিদ্র কিশোর, দর্জি, সংগ্রামী নারী প্রমুখ। তাছাড়া শহুরে বস্তিবাসী, রিক্সাচালক, কুলি, কাজের বুয়া, পকেটমার, অফিসের পিয়ন, খুনি, অসহায় শিশু-কিশোর হয়ে উঠেছে হুমায়ূন আহমেদের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। 'তুচ্ছ', 'অয়োময়', 'সগিরন বুয়া', 'বান', 'খাদক', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আলাউদ্দিনের ফাঁসি', 'ভালোবাসা', 'অতিথি', 'অপরাহ্ন', 'সুলেখার বাবা', 'পিশাচ', 'জিন-কফিল', 'নয়া রিকশা', 'শিকার'–গল্পে নিম্নবিত্তের জীবন ওঠে এসেছে।

সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বদরুল আলম সাহেব। শরীরচর্চা এবং দেশচর্চায় বর্তমানে তিনি উদ্বিগ্ন। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস করার কারণে গল্পকথকের সঙ্গে তাঁর সখ্য রয়েছে। দেশচর্চা নিয়ে তাঁর উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত ভাবনায় :

> প্রফেসর সাহেব, কিছু একটা তো করতে হয়, কি বলেন? ভেজিটেবলের মতো বেঁচে থাকার তো কোনো মানে হয়না।[১]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৩১।

দেশ নিয়ে তিনি যে বিস্তর গবেষণা করছেন তা তার কর্মকাণ্ড থেকেই আন্দাজ করা যায়। প্রতিদিন পৃথিবীতে চল্লিশ হাজার শিশু মারা যায়। তিনি জানান বাংলাদেশের অবস্থা আরও ভয়াবহ।'এই যে ছোট ছোট শিশু রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করছে, এদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে'।[১]

জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার জন্য বদরুল আলম সাহেব রুটি বিতরণ সমিতি 'রুবিস' গঠন করলেন। গল্পকথক নিতান্ত অনিচ্ছায় এ সমিতির একজন একজিকিউটিভ সদস্য। সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত হলো রুবিসের কার্যকলাপ বর্ষা মৌসুমে শুরু হবে। অতঃপর বৈশাখ মাসের এক বিকালে রাজধানীর দোয়েল চত্বরে গল্পকথকের সঙ্গে দেখা হলো বদরুল আলম সাহেবের। সাথে আরো চারজন ছেলেমেয়ে। গল্পকথক হাসিমুখে বললেন– 'আলম সাহেব, আপনি মনে হচ্ছে আপনার রুটি বিতরণের সাবজেক্ট পেয়ে গেছেন।' বদরুল আলম সাহেবের বিরক্তি মিশ্রিত উত্তর শুনে লেখক প্রসঙ্গ পাল্টালেন।

তারপর রুবিসের প্রধান নির্বাহী দ্রুত পদে চলে গেলেন। জানা গেল ময়মনসিংহের ত্রিশালে ছেলেমেয়েগুলোর বাড়ি। তাদের মা নেই। বাবা গাতক মানুষ। মনের বাউলিয়ানায় সংসার ছেড়ে কোথায় গেছেন কেউ জানে না। একপর্যায়ে তাদের আশ্রয় হলো নানা বাড়ি। মামাই তাদের শহরে এনেছে বাবার খোঁজ পাওয়ার কথা বলে। তারা বুঝতে পারছে না মামা সটকে পড়েছে। নিরন্ন অসহায় ছেলেমেয়েগুলো ক্রমাগত কাঁদছে। কিন্তু এ কান্না শহুরে মানুষের কানে পৌঁছেনা।

পরদিন বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে গল্পকথকের দেখা হয় বাজারে। তিনি ইলিশ মাছ নিয়ে ফিরছেন। তাদের কথোপকথন–

- রুবিসের কাজকর্ম তো শুরু করা উচিত। বর্ষা তো এসে গেল। তাই না?
- হ্যাঁ তাই। বর্ষা এবার আগে ভাগে নামবে।
- এ বছরেও ফ্লাড হলে তো সর্বনাশ। ফ্লাডের ব্যাপারটাও কনসিডারেশনে রাখতে হবে।[২]

গল্পটিতে সর্বসহায়হারা মানুষের অস্তিত্বসংকটটি স্পষ্ট হয়েছে। নিরন্ন মানুষ ভিড় করছে শহরে। এসময় কেউ কেউ (যাদের দেশপ্রেম অতি উচ্চতায়) দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকেন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন। গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন কিন্তু এসব উদ্যোগ বাস্তবে প্রান্তিক জীবনকে স্পর্শ করেনা। কার্যত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-মান পরিবর্তনে নাগরিক মানুষের অবদান অতি অল্প।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৩১

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৩৪

প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অবলম্বনে রচিত গল্প 'অয়োময়'। গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন মানুষ বদরুল আলম সাহেব। অত্যন্ত রাগী মানুষ। বৃদ্ধ বদরুল আলম সাহেবের বাড়ির বাংলা ঘরে গ্রামের লোকজন ধরে এনে আশ্রয় দিয়েছে মুমূর্ষু ইউনুসকে। অর্ধেকটা শরীর তার পঁচে গিয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার সাহেব বলে দিয়েছেন বড়জোর দুদিন টিকবে। যে মানুষের আয়ু মাত্র দুদিন তার সাথে রাগ চলে না। ফলে বদরুল আলম সাহেব ইউনুসের থাকার ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। কিন্তু যে রোগীর দুদিন বাঁচার কথা সে তেরোদিনের মাথায়ও জীবিত। ডাক্তারদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে বদরুল আলম সাহেব প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন। পুরো বাড়ি পঁচা দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছে; মনুষ্য বাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বদরুল আলম সাহেব মসজিদের মৌলানাকে দিয়ে তওবা পড়ালেন দুবার করে। ইউনুসের পছন্দের খাবার 'তেঁতুলের পানি দিয়ে ভাত' খাওয়ালেন। আর মাত্র তিনদিন বড় জোর সে বাঁচতে পারে। তওবা পড়ানোর তৃতীয় দিন রাতে ইউনুসের বুকের ভেতর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। মুখে ফেনা ভাঙছে। রাত যে কাটবে না, তা বোঝাই যাচ্ছে।

কিন্তু রাত কাটল। ভোরে বদরুল আলম সাহেব খোঁজ নিতে গিয়ে জানলেন অবস্থা কিছুটা ভালো। শ্বাসকষ্ট নেই। ইউনুস বলল– 'রাইতে একটা শিয়াল ঢুকছিল। পা ও হাতে কামড় দিছে। আইজ আপনে বইলা দিবেন হাতের কাছে যেন একটা লাঠি দেয়। আর একটা হারিকেন।'[১]

বদরুল আলম সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আরো খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, যে দুবার তওবা পড়ানো হয়েছে কোনো বারই সে তওবা পড়েনি। মনে মনে উল্টা কথা বলেছে। এই সংবাদটি দিল বদরুল আলম সাহেবের কাজের লোক মজনু। কেন পড়েনি তার জবাবে সে বলেছে–'তওবা করলে জেবন শেষ এই জন্যে।' ইউনুস ক্ষীণস্বরে আরও জানায়– 'মরতে চাই না।'

গল্পের শেষে দেখা যায়, স্বয়ং বদরুল আলম ইউনুসকে বাঁচিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন – 'তোর যখন অতই বাঁচনের শখ, দেখি একটা চেষ্টা কইরা। চল, তোরে ময়মনসিংহ নিয়া যাই। দেখি কী অবস্থা।'[২]

অতঃপর তিনি মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা করলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে নিজেই চললেন গাড়ির সাথে। অনেক দৌড়-ঝাঁপের ব্যাপার, যাকে তাকে বিশ্বাস করা যায় না। ময়মনসিংহের ডাক্তাররা জবাব দিলে যেতে হবে ঢাকা। বিস্ময়করভাবে লেখক দুই বিপরীত বিত্তের দুজন মানুষকে একই অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জয় হলো মানবতার।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৫৫।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৫৬।

ইউনুস ও বদরুল আলম সাহেবের কথোপকথন :

- 'ইউনুস'

- ' জে '

- ' ঝুলে থাক। হাল ছাড়িস না, আমি আছি।

ইউনুসের চোখ দিয়ে পানি পড়ে। সে প্রাণপণে ঝুলে থাকতে চেষ্টা করে। মহিষের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যায়।[১]

আনন্দ-উৎসবহীন একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন হলেও মর্ত্য প্রেমকে উপেক্ষা করা মানুষের জন্য কঠিন। উল্লেখযোগ্য কোনো আত্মীয় স্বজনও নেই ইউনুসের। তবু পৃথিবীর প্রতি ইউনুসের প্রবল টানকে উপেক্ষা করতে পারেননি জোতদার বদরুল আলম সাহেব। এই গল্পে একজন উচ্চমধ্যবিত্ত দায়িত্ব নিচ্ছেন প্রান্তিক মানুষের । মূলত দায়িত্ব নয়, একজন মানুষের বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে শুশ্রূষা ও শ্রদ্ধা করেছেন তিনি। এই মনুষ্যত্বের অন্বেষণই হুমায়ূন আহমেদের মূল আরাধনা।

চিরায়ত মাতৃত্বের রূপটি ধরা পড়েছে 'সগিরন বুয়া' গল্পে। গল্পটি অত্যন্ত সরল। ধানমন্ডির তিন নম্বর রোডের একটা ফ্ল্যাটে কাজ করে বস্তিবাসী সগিরন। রিকশা চালক স্বামী জয়নাল দুর্ঘটনায় পড়ে বাঁ পা হারিয়েছে। সংসার চালাতে সগিরনকে বাসা বাড়ির কাজ নিতে হয়েছে। টুলটুল নামের একটি ছেলেকে দেখাশোনার দায়িত্ব সগিরনের। চাকরিজীবী স্বামী-স্ত্রীর একমাত্র সন্তান টুলটুল। সারাদিন কাজ সেরে রাতে বাসায় গিয়ে স্বামী জয়নালের সাথে টুলটুল বিষয়ক নানা গল্প করে সগিরন। শিশু-সন্তানটির প্রতি দুজনেরই ব্যাপক কৌতূহল।

অভাবী সংসারে মাত্র তেরো মাস বয়সের সালমা নামের এক কন্যা সন্তানকে এক হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল জয়নাল-সগিরন। টুলটুলের প্রতি তাই তাদের অপার আগ্রহ। একটি ফটোগ্রাফে তারা টুলটুলকে দেখে আর তার চোখে-মুখে খুঁজে পায় বিক্রিত সন্তানের অবয়ব। গল্পটিতে মাতৃত্বের চিরায়ত রূপটি যেমন আছে তেমনি নাগরিক জীবনে নিম্নবিত্তের প্রতি মধ্যবিত্তের স্নেহ-মায়া-ভালোবাসার দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে। প্রান্তিক মানুষের দায়িত্ববোধের পরিচয়ও বিধৃত হয়েছে।

নদী-তীরবর্তী বানভাসী মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে 'বান' গল্পে। ছাব্বিশ বছরের যুবক রহমানের দাদি, মা, ছোটভাই এবং একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তার পরিবার। নদীর ভাঙনে শুরু হয়েছে বন্যা। এরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় পরিবারটির চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই ।

ভাগ্যবিড়ম্বিত, নিয়তিতাড়িত নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষকে টিকে থাকতে হয় প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৫৬

দুর্যোগপ্রবণ রাতের বিবরণটি লেখক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত করেছেন –

> অন্ধকার রাত। অঝোরে পড়ছে বৃষ্টি। চারদিকে ফুলে-ফেঁপে উঠছে পানি। রাত্রির মতোই অন্ধকার জলরাশি। দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়ি ঘর থেকে চিৎকার ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে। নদীর শোঁ শোঁ আওয়াজের সঙ্গে সে কোলাহল মিশে অদ্ভুত শব্দ হয়।[১]

প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় মানুষের টিকে থাকার গল্প 'বান'। চলমান জীবনের গতি এ গল্পের মূল উপজীব্য। টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে প্রান্তিক মানুষের দুর্বিষহ জীবনচিত্র বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূন আহমেদের অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় ছোটগল্প 'খাদক'। না খেতে পাওয়া প্রান্তিক মানুষ হয়ে উঠেছে এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম মতি মিয়া। পার্শ্ববর্তী দু-চার গ্রামে তার পরিচিতি 'খাদক মতি' নামে। বিখ্যাত খাদক মতি। এক বৈঠকে আধমণ গোশত খেতে পারে সে। মতি বিভিন্ন সময় খাওয়ার কসরত দেখিয়ে এ পর্যন্ত তিনটি মেডেল জিতেছে। নেত্রকোণার সিও রেভিন্যু, আজিজিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি মতির এ অকল্পনীয় গুণের পুরস্কার দিয়েছেন। অনেক দূর থেকে লোকেরা এসে মতিকে 'হায়ার' করে নিয়ে যায়। কারণ –

> বাজির খাওয়া হয়। মতি যায়, বাজি জিতে আসে। বরযাত্রীরা সাথে করে নিয়ে যায়। মতি সঙ্গে থাকলে মেয়ের বাড়িতে খাওয়া শর্ট পড়ে। মেয়ের বাপের একটা অপমান হয়। মেয়ের বাপের অপমান সবাই চায়।[২]

মতি আর কোনো কাজ করে না। অভাবনীয় খাবার খেয়ে মানুষকে অবাক করাই তার পেশা। এ প্রসঙ্গে মতির দার্শনিকতামণ্ডিত ভাবনা – 'এক সাথে দুই তিনটা কাম করলে কোনোটাই ভালো হয় না। আল্লাহতা'লা একটা বিদ্যা দিছে। খাওনের বিদ্যা। অন্য কোনো বিদ্যা দেয় নাই।'[৩]

গ্রামে বিশিষ্ট মেহমানরা এলে মতি মিয়ার ডাক পড়ে। বিশিষ্ট মেহমানকে চমকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় খাদক মতির খাওয়ার কসরত দেখিয়ে। খাবারের আসরে কখনো কখনো তার ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত হয়। দুর্বল হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার কয়েকটি শিশু চোখ বড়ো বড়ো করে বাবার খাওয়া দেখে।

একদল ক্ষুধার্ত মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে আর সে খেয়েই যাচ্ছে। লেখক গল্পের শেষ পর্যায়ে একটি মানবিক পরিসমাপ্তি কল্পনা করছেন –

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৭৩।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১২২।

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১২৩।

> রাত একটার দিকে মতি মিয়া যদি ঘোষণা করে– বাকি গোশত আমি আর খাব না, এখানে যারা আছে তারা খাক। মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুর দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে– কর কী কর কী? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো ! এটাও খাও !' মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে হারলে হারব।[১]

কিন্তু এমনটি হওয়ার নয়। মতি মিয়াকে জিততেই হবে। গল্পটির রচনাকাল আশির দশক। এ সময়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল। একজন স্বৈরাচারের রাহুগ্রাসে টালমাটাল পুরো দেশ। রাজনৈতিক বাজির কাছে জিম্মি গণতন্ত্র, রক্তস্নাত বাংলাদেশ। একেকটি বর্ণমালার মতো ঝরে পড়ে নূর হোসেনরা; কিন্তু খাদকের বোধোদয় হয় না। কারণ, এতকিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।

একজন ধারাবাহিক খুনির গল্প 'কৃষ্ণপক্ষ।' হানিফ নামের এই লোকটির পেশা মানুষ খুন করা। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সে চুক্তিতে মানুষ খুন করে। সেদিন সে দাঁড়িয়েছিল রইসুদ্দিন নামের একজনকে খুন করার জন্য। দাঁড়ানো অবস্থায় তার মনে পড়ে অতীতের নানান কথা। প্রথম খুন কাকে, কীভাবে করেছিল, তারপর কাকে এবং তারপর কাকে– এমন নানা বিক্ষিপ্ত ভাবনায় তার সময় কাটে। মানুষ খুন করার আগে মানুষটার সাথে সে পরিচিত হয়। তার বাড়ীতে একবার যায়। পরিবার-পরিজনকে দেখে আসে। তার বড় ভালো লাগে ভাবতে যে, মৃত মানুষটার আত্মীয়-স্বজনরা কেমন করে কান্নাকাটি করবে। হানিফ নামের এই খুনিটার অতীত ছিল বেদনাময়–

> মেয়েটা মারা গেল পেটের ব্যথায়। কোনো চিকিৎসা করাতে পারেনি। কী চিকিৎসা করাবে, হাতে নাই একটা পয়সা। মেয়েটা ছটফট করেছে আর বলেছে– বাজান, আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও।[২]

হুমায়ূন আহমেদ নেতিবাচক চরিত্রের ওপরও নিবদ্ধ করেন সহানুভূতিশীল দৃষ্টি। দুর্ধর্ষ খুনি চরিত্রটিকেও তিনি পাঠকের মমতারসে সিক্ত করতে পেরেছেন। এখানেই হুমায়ূন আহমেদের অভিনবত্ব। ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষ। প্রান্তিক মানুষের বীভৎস দিকটি এ গল্পের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে।

ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের মন্দ চরিত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে 'আলাউদ্দিনের ফাঁসি' নামক গল্পে। শিশু হত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধে জড়িত আলাউদ্দিন। সে শিশুকে জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা করে। শিশুটির মা-বাবা পুলিশের সহায়তা নিলে ধরা পড়ে আলাউদ্দিন। কিন্তু পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পূর্বেই শিশুটিকে নির্মমভাবে খুন করে সে। তবে আলাউদ্দিন যে প্রকৃত খুনি সেটা আদালতে প্রমাণ করা যায়নি। গল্পের শেষে জজ সাহেবের কাছে আলাউদ্দিন স্বীকার করে তার অপরাধকর্মের কথা। আদালতে তার কৌশলের কারণে আলাউদ্দিন নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করে। আলাউদ্দিন অত্যন্ত ধূর্ত এবং কৌশলী।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১২৬।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৪২।

তার ধূর্ততার কাছে কেউ পাত্তা পায়নি। প্রয়োজনীয় আলামত এবং সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে ফাঁসির আসামিও কীভাবে মুক্তি লাভ করে সেটি গল্পকার চমৎকারভাবে বয়ান করেছেন। হুমায়ূন আহমেদ চরিত্রটিকে এমন নিপুণভাবে অংকন করেছেন যে তার স্বীকারোক্তির পূর্বে তাকে গোবেচারা নিরীহ মানুষ বলেই মনে হয়। গল্পের শেষাংশে পাঠক চমকে ওঠে তার বক্তব্যে –

> পুলিশ যখন আলামত হিসেবে জুতা জব্দ করেছে, তখনই বুঝেছি মামলা ডিশমিশ। হা হা হা। খুন আমিই করেছি। আপনার মতো ঝানু লোক ধোকা খেয়েছেন। এইটাই আনন্দের।[১]

আলাউদ্দিন শিশুটিকে হত্যার পর পরই এক জোড়া জুতা কিনে তার ঘরে রেখে দেয়। জুতা জুড়া শিশুটির পায়ে থাকা জুতোর মতোই হুবহু দেখতে। পুলিশ জুতো জুড়া আলামত হিসেবে আদালতে হাজির করে। কিন্তু শিশুটির লাশের যে ছবি পত্রিকায় প্রচারিত হয় তাতে দেখা যায় তার পায়ে জুতো জুড়া আছে। এই পয়েন্টে মামলাটিকে সাজানো, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই আদালত রায় দেয়। ফাঁসির আসামী বেকসুর খালাস পায়।

এই গল্পটিতে আদালতের বাস্তব কিছু চিত্র আছে। রাষ্ট্র পরিচালিত মামলা সমূহের দুর্বল দিকগুলোও যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একজন জজ সাহেবের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনও সুন্দরভাবে ওঠে এসেছে এ গল্পে। জজ সাহেবের চরিত্রটিও অতি দরদি ও মানবিকতায় ঋদ্ধ –

> জীবনে সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা কী জানো দাদু? যখন ফাঁসি হতে যাচ্ছে এমন একজন লোক নির্দোষ প্রমাণিত হয়। খালাস পেয়ে বাড়ি চলে যায়। আমার জীবনে কয়েকবার এ রকম ঘটনা ঘটেছে।[২]

নিম্নবিত্ত মানুষের অন্ধকার জগতের গল্প 'ভালোবাসা'। আবুল কাশেম ও সুইটি স্বামী-স্ত্রী। কারওয়ান বাজারের কোনো একটি বস্তিতে দুই রুম নিয়ে ভাড়া থাকে আবুল কাশেম। সে মলম পার্টির একজন সদস্য হিসেবে বিভিন্ন 'অপারেশনে' যোগ দেয়। তার স্ত্রী সুইটির একমাত্র কাজ সাজগোজ করা। আগে সে গ্রামেই থাকতো। তার হাত খরচের জন্য সাতশ করে টাকা পাঠাতো আবুল কাশেম। শহরে এসে সুইটি দেখল সংসার বলতে কিছু নেই। ঘরে কোনো আসবাব নেই। মুখ দেখার মতো আয়না পর্যন্ত নেই। সে বড়ই বিপদে পড়ল। আবুল কাশেম কী করে তা নিয়ে সুইটির মাথাব্যথা নেই। মানুষটা খুবই রহস্যময়। সারাদিন ঘুমায়। আবার বলে ব্যবসা করে সে। এখন ব্যবসাটা মন্দ যাচ্ছে। একদিন আবুল কাশেমের ব্যবসায়িক পার্টনার হারুন নামের এক লোক এলো বাসায়। আবুল কাশেম তাকে ডাকে ওস্তাদ। তাকে খুব খাতির করা হলো। হোটেল থেকে কাবাব-পরোটা এনে খাওয়ালো। হারুনকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা এমন –

> হারুন চলে যাবার পর সুইটি বলল, লোকটি ভালো না। কাশেম বলল, ভালো না বুঝলে কীভাবে? সুইটি গলা নিচু করে বলল, সারাক্ষণ আমার বুকের দিকে তাকিয়ে ছিল। আবুল কাশেম বলল, কদুর মতো বুক বানায়েছ। বুকের দিকে তো তাকাবে।[৩]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৯০৯।

[২].প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৯০৮।

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৯১১।

কিছুদিন পর আবুল কাশেমের ওস্তাদ হারুনের মৃত্যু-সংবাদ ছবিসহ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। সুইটি প্রথম জানল তার স্বামীর আসল ব্যবসাটা কী। সংবাদটি পড়ে এবং তার স্বামীর এই পেশাটি সম্পর্কে জেনে কিছুক্ষণ কাঁদল সুইটি। সে গ্রামে ফিরে যেতে চাইল। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না। কারণ যাওয়ার মতো কোনো আশ্রয় তার নেই।

এরপর সুইটিও স্বামীর পেশাকে মেনে নিল। আবুল কাশেম যা ছিনিয়ে আনে তা প্রথমে দেখে সুইটি। তার খুব ভালো লাগে। তারা দুজনেই স্বপ্ন দেখে একদিন 'বড় দান' মারবে আবুল কাশেম। স্ত্রীকে সে বুঝায়– তাদের কাজ ছিপ দিয়ে মাছ ধরার মতো। বেশির ভাগ সময়ই পুঁটি, খইলসা, টেংরা ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ বিশাল বোয়াল।

একদিন দয়া দেখাতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়েছিল আবুল কাশেম। সিএনজিতে থাকা এক লোক, অঙ্কের প্রফেসর আবুল কাশেমের পা জড়িয়ে ধরে বলেছে– 'ভাই, আমাকে মলম দিয়েন না, আপনার পায়ে পড়ি'। আবুল কাশেম মলম না দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় সিএনজি থেকে। তারপরই লোকটি চিৎকার শুরু করে।

অল্পের জন্য বেঁচে যায় আবুল কাশেম। তারপর স্বামী-স্ত্রীর আলোচনায় বেরিয়ে আসে মলম না দেয়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। এরপর আর ভুল করা যাবে না। স্বামী অল্পের জন্য আজ রক্ষা পেল– এটা ভাবতেই সুইটির চোখ ভিজে উঠল। ভালোবাসার সে চোখ। কী বিচিত্র মানুষের মন ! নিষ্ঠুরতার মাঝেও ভালোবাসার অপূর্ব বুনন মানুষের মনে।

প্রান্তিক শ্রমজীবী নারীর আখ্যান 'অতিথি' গল্প। সফুরা নামের এই নারী ঢাকা শহরের একটি বাসায় মাসিক দুইশ টাকা বেতনে কাজ করে। স্বামী-সন্তান-সংসার ফেলে তিন বছর ঢাকায় কাটিয়ে দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে সফুরা। তার স্বামী এসেছে তাকে নিতে। স্বামী তার মাঝে মাঝেই আসত টাকা নিতে। সফুরার বড় কষ্টের টাকায় চলতো স্বামী-সন্তানদের ভরণ-পোষণ। সফুরার বেগম সাহেবা সুন্দর মনের মানুষ। ফলে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। সফুরাও কাজে কর্মে যথেষ্ট দায়িত্বশীল বলে সকলের স্নেহ-মমতা লাভ করেছে। জাপান থেকে সফুরার মালিকের কিছু আত্মীয়-স্বজন আসে। যাওয়ার সময় তারা সফুরাকে একটি ঘড়ি দিয়ে যায়। সফুরার স্বামীর স্বভাব তার দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ :

> লোকটা বেজায় সৌখিন। টাকা নিতে যখন আসে মনে হয় ভদ্রলোক। মাথার চুল বেশির ভাগই পেকে গিয়েছিল। একবার এলো– সব চুল কুচকুচে কালো। চুলে কলপ দিয়েছে। পাঁচ দশ টাকা নিশ্চয়ই চলে গেছে। লোকটা এইসব দেখবে না। বড় সৌখিন।[১]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৮০৬।

স্বামীর প্রতি সফুরার ভালোবাসা অন্তহীন। কিন্তু তার সৌখিন এই মানুষটি তাকে না জানিয়ে যে আবার বিয়ে করেছে তা সে জানতে পারে গাড়িতে ওঠার পর– 'তুমি ঢাকায় চইল্যা আসলা, বাড়ি হইল খালি। ঘরের শতেক কাজকর্ম। সংসার ভাইস্যা যাওনের উপক্রম। গেরামের দশজনে তখন বলল ....।' সফুরার চোখে পানি চলে এলো। চিৎকার করে কাঁদতে লাগল সে। কিন্তু কেঁদে কী হবে? সকলের জন্য এটা-ওটা কিনল সে। নতুন বউয়ের জন্যও শাড়ি, চুড়ি, ফিতা কিনে রওয়ানা হলো সফুরা। নিজের সংসারে সে যাচ্ছে অতিথি হয়ে। প্রান্তিক মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন, সংসারের প্রতি দায়িত্ব ও ভলোবাসার স্বরূপটি গল্পের শেষে ফুটে ওঠেছে –

> শীতকালের পড়ন্ত রোদে সে বেড়াতে যাচ্ছে। পাশে স্বামী। কতদিন পর দেখবে ছেলেমেয়েদের। আনন্দে তাঁরা চিৎকার করে কাঁদবে। সারারাত হয়তো ঘুমুবে না। নয়া বৌ লালপেড়ে শাড়ি পরে তাকে এসে কদমবুসি করবে। সে নয়া বউকে বলবে– আমার অনেক কষ্টের এই সংসার। তুমি এরে দেখেশুনে রাখো। বলতে বলতে সে হয়তো কেঁদে ফেলবে। আজকাল অকারণেই তার চোখে জল আসে।[১]

সন্তান-সংসারের জন্য প্রান্তিক মানুষের ত্যাগী মানসিকতা 'অতিথি' গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। প্রান্তিক জীবনে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের দিকটি এ গল্পে শিল্পমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যস্ততম নাগরিক জীবনে প্রান্তিক মানুষের উন্মীলিত চিত্র আছে 'অপরাহ্ণ' গল্পে। মধ্যবিত্ত ইসহাক সাহেব ঝিকাতলা যাওয়ার জন্য যে রিকশাটি ঠিক করলেন কাকতালীয়ভাবে সে রিকশাওয়ালার নামও ইসহাক। রিকশাওয়ালাটিকে তার পছন্দ হলো না। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। দেখেই মনে হলো– লোকটি উপদ্রবী।

কিছুদূর যেতেই রিকশাওয়ালাটি রিকশা থামাল। পেটে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ল। ইসহাক সাহেব ভাবলেন– লোকটি বাড়তি টাকা উপার্জনের ধান্দা করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই লোকটি রক্তবমি শুরু করল। দুজন লোক তাকে ধরে বেবিট্যাক্সিতে করে পিজি হাসপাতালে নিয়ে গেল। রিকশাওয়ালা বেঁচে থাকা পর্যন্ত ইসহাক সাহেবের হাত ধরে বলে গেল রিকশাটি যেন তিনি দেখেন। ইসহাক সাহেব খালি রিকশা টেনে থানা পর্যন্ত গেলেন। সেখান থেকে আবার পিজিতে গেলেন ইসহাক মিয়াকে একবার দেখতে এবং রিকশাটির অবস্থান জানাতে।

ইসহাক মিয়াকে মৃত পাওয়া গেল। লাশের আশেপাশে কাউকে দেখা গেল না। ইসহাক সাহেব পিজি থেকে বেরিয়ে এলেন। ছয়টায় ছোট মেয়েকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে। তার হাতে সময় কম। তিনি আরেকটি রিকশা নিয়ে ছুটলেন বাড়ির দিকে। নাগরিক ব্যস্ততার মাঝেও মানবিক দায়িত্ববোধ, কর্মচঞ্চলতা গল্পটিকে দুরন্ত গতি দিয়েছে।

নগরজীবনের নিদারুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে কিছুটা মানবিকতার চিহ্ন আছে তা পরিস্ফুটিত হয়েছে এ গল্পে। দুই প্রান্তের দুই ইসহাককে এক সরলরেখায় দাঁড় করিয়ে হুমায়ূন হয়ে উঠলেন মায়াবী গল্পের মানবিক জাদুকর।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা- ৮০৯।

বশির মোল্লার পুরনো চাকর কেরামত। দশ বছর বয়স থেকেই তার কাছে আছে কেরামত। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স কেরামতের। বোকা ধরনের মানুষ। এখনো বিয়ে করেননি। বশির মোল্লার কাছে বিয়ের ব্যবস্থার কথা বলে সে। বশির মোল্লা জানায়– 'আচ্ছা ঠিক আছে, হবে। আমিই ব্যবস্থা করব। ঘর তুলে দিব। জমিও দিয়ে দিব। বেতন তো কিছু নেস না। সব জমা আছে ব্যবস্থা করে দিব।'[১]

কিন্তু বশির মোল্লা থাকে নানা ঝামেলায়। ব্যবস্থা করার মতো অবস্থায় সে নেই। দ্বিতীয় স্ত্রী পোষ মানছে না, গ্রামে ডাকাতদের উপদ্রব, স্কুল কমিটির নির্বাচনে হার, জমিসংক্রান্ত নানা মামলা, পৌরসভার নির্বাচন– এতকিছুর মধ্যে কেরামতের বিয়ের ব্যবস্থা করা সহজ বিষয় নয়। তবু কেরামত বিয়ের কথা তুলে ধমক খায়। মোল্লা জানায়– 'একটু সামলে উঠি, তারপর ব্যবস্থা করব।'

বশির মোল্লা ভালোভাবেই সামলে উঠলেন। নির্বাচনে জিতলেন। স্কুল কমিটির সভাপতি হলেন। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি আনলেন। তিনি শহরে থাকা শুরু করলেন। গ্রামে আসেন মাঝে-মধ্যে। আবার কেরামতকে বিয়ের কথা বলেন নিজ থেকেই– বিয়ে একটু বেশি বয়সে হওয়াই ভালো। বশির মোল্লা ঘর তুলবার জায়গাটিও দেখিয়ে দেয়। এ শ্রাবণেই বিয়ে হবে। বিয়ের জন্য শ্রাবণ মাস ভালো সময়। কেরামত বাড়ির চারপাশে ফলের গাছ রোপণ করে। ছেলে-পুলেকে ফল ফলান্তি কিনে খাওয়ানো তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেরামত অপেক্ষা করে। তার বয়স এখন পঞ্চান্ন। চোখে ভালো দেখতে পারে না। মাথার সব চুল পেকে গিয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরে অনাগত স্ত্রী ও সন্তানদের কথা ভাবতে তার বেশ লাগে।

প্রান্তজনের স্বপ্নসংকট এ গল্পে নৈপুণ্যের সাথে বর্ণিত হয়েছে। মালিকের প্রতি গভীর আস্থা এবং শ্রমিকের প্রতি মালিকের চরম উদাসীনতার দিকটিও গুরুত্বসহ বর্ণিত হয়েছে গল্পে। নিম্নবিত্তের জীবন-স্বপ্ন-সাধের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থবাদী মানুষের নির্বাচনে বিজয়, পাওয়ার টিলার ক্রয়, মামলায় স্বপক্ষে রায় পাওয়া। হুমায়ূন আহমেদ সমাজ বাস্তবতার মূলে অনুসন্ধান করে তুলে এনেছেন জীবনঘেঁষা নিরন্ন মানুষের মনোজগতকে; তুলে ধরেছেন স্বপ্ন-সাধের ভঙ্গিল স্বরূপকে।

নিম্নবিত্ত মানুষের বাৎসল্যপ্রীতির গল্প 'সুলেখার বাবা'। সুলেখা উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের পালিত কন্যা। সে একদিন সকালবেলা নতুন এক লোককে দেখল তাদের গেটের কাছে। লোকটির পরনে ময়লা গেঞ্জি এবং খুবই নোংরা একটি লুঙ্গি। লোকটি কিছুক্ষণ পরপর থু থু ফেলছে তার চারপাশে। লোকটির চোখ ফোলা ফোলা। চোখের কোণায় ময়লা জমে আছে। মনে হয় সে কোনদিন দাঁত মাজে না– এমনই নোংরা তার দাঁত। লোকটিকে দেখেই সুলেখার পালিত মা ভয়ংকর রেগে গেলেন। তার বাবাও গেলেন রেগে। তাকে পুলিশে দেওয়ার কথা পর্যন্ত বলল তারা। সুলেখা কিছুই বুঝতে পারল না। সুলেখার জন্মদাতা পিতা এখানে আসার কৈফিয়ত দিচ্ছে– মনটা বড় টানে তার।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।

মন টানে কেন? তাকে তো যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছিল। শর্ত ছিল সন্তানকে দেখার জন্যও কোনোদিন তারা আসবে না। তবে আবার এসেছে কেন? বাড়ি পাল্টিয়েও যে লাভ হলো না তাই সুলেখার পালক মা-বাবা চিন্তা করছে। একশ টাকার একটি নোট দিয়ে সুলেখাকে তাঁরা পাঠান তার জন্মদাতা পিতার কাছে। সুলেখাকে দেখেই দু-চারটি প্রশ্ন করে তার জন্মদাতা পিতা। আর বলল–

> খুব অভাবের মধ্যে পড়ছিলাম গো। খুবই অভাব। ভাতের কষ্ট হইল গিয়া খুব বড় কষ্ট। পেটের জইন্যে এই কাম করলাম। ওমন কুকাম করলাম। ...আমারে চিনা চিনা লাগে না গো মা? ভালো কইরা দেখ।[১]

না, সুলেখা তাকে চিনতে পারে না। লোকটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। সুলেখা টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মা এসে সুলেখাকে ভিতরে নিয়ে যায়। গেট সশব্দে বন্ধ হয়। প্রান্তিক জীবনের টানাপোড়েন এবং অভাবের তাড়নায় সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার এ গল্পটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

'জনৈক আব্দুল মজিদ' মানুষের সচেতনতার প্রয়োজনে লেখা একটি চমৎকার গল্প। হুমায়ূন আহমেদ নিজেই বলেছেন– 'বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ফরমায়েসি এক তাড়াহুড়ার লেখা। গল্প বলা বা গল্প নির্মাণের আনন্দ অনুপস্থিত। প্রবন্ধের মুক্ত যুক্তির প্রান্তরও নেই। কী আর করা।'

সিলেটের কোনো এক গ্রামের আব্দুল মজিদ (ছদ্মনাম)। ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করতে গিয়ে ঘাতক ব্যাধি এইডস নিয়ে দেশে ফিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে সে। এই গল্পে এইডস রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার সম্পর্কে চমৎকার উপস্থাপনা আছে। তবে গল্পের আনন্দ নেই এ কথা সত্য।

প্রান্তিক মানুষের প্রেম ও দরদি মনের গল্প 'পিশাচ'। মকবুল নামের এক লোক পিশাচ হওয়ার সাধনা করে চলেছে। তার সাধনা যেদিন শেষ হবে সেদিন থেকে সে অসাধ্য সাধন করতে পারবে। লোকে তাকে সমীহ করবে। দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে না। ভাত-সালুনের অভাব হবে না। কর্মহীন এই মানুষটার হৃদয় ভালোবাসার সমুদ্র। তার মামাতো বোন কইতরির বিয়ে হয়েছে পাশের গ্রামের ইসমাইলের সঙ্গে। তাদের দুটি সন্তানও আছে। মকবুলের সাধনা শেষ হলে সে চাইলে কইতরিকে বিয়েও করতে পারবে। কইতরির জন্য তার প্রচণ্ড প্রেম। দিনে একবার হলেও দূর থেকেই তাকে দেখে আসে মকবুল। আর তো কয়টা দিন বাকি। তারপরই তার ভালোবাসার মানুষটাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। পিশাচ হলে খাওয়া-খাদ্যের অভাব থাকবে না।

তবে মকবুল প্রথম কাজটাই করতে পারছে না। সাধনার প্রথমেই দশটা কাক পানিতে চুবিয়ে মেরে ফেলতে হবে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪৫৯

একটি কাক নিয়েই সে প্রায় ছয়মাস ঘুরে বেড়াচ্ছে – 'দুইবার পুসকুনিতে নামছি এরে চুবাইয়া মারার জন্যে, দুইবারই উইঠা আসছি। জীবন্ত একটা প্রাণী পানিতে চুবাইয়া মারা তো সহজ কথা না।'[১] বুকে ভালবাসার সমুদ্র নিয়ে মকবুল পিশাচ হওয়ার সাধনা করে যাচ্ছে।

দারিদ্র্য-দুঃখ-যন্ত্রণায় মানুষের বিকৃত আচরণের গল্প 'জিন-কফিল'। নেত্রকোণার ধুন্দুল নাড়া গ্রামের মুনশি এরতাজ উদ্দিনের স্ত্রীর নাম লতিফা। নেত্রকোণার বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিনের বাড়িতে পেটে-ভাতে কাজ করত এরতাজ উদ্দিন। খুবই নেকবন্দ মানুষ তিনি। মমতাজউদ্দিনের ছোট মেয়ের নাম লতিফা। লতিফা রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী। লতিফাদের বাড়ির সকলেই এরতাজ উদ্দিনকে খুবই স্নেহ করত। পুত্রস্নেহে তাকে লালন করেছে সকলেই। এরতাজ উদ্দিনও স্নেহের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বাড়ির প্রায় সকল কাজই সে করে দিত।

লতিফার চঞ্চলতা, বুদ্ধিমত্তা, একরোখা স্বভাবের কারণে এরতাজ উদ্দিন তার প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে সে কখনো দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। অকারণে লতিফা তাকে নানা ধরনের যন্ত্রণা দিতে থাকে। তবে এরতাজউদ্দিনের কাছে যন্ত্রণাগুলোও মধুর মনে হতো। যখন তখন তার ঘরে আসা, দেখা হলেই ধাঁধা জিজ্ঞেস করা, লাস্যময়ভাব – এসব কারণে লতিফার প্রতি সে এক ধরনের আসক্তি অনুভব করে।

লতিফার বিয়ের প্রস্তাব আসে গৌরীপুর থেকে। বনেদি পরিবার। বিয়ের দিন তারিখও ঠিক হয়ে যায়। এরতাজ উদ্দিন বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। চালের আড়তে কাজ করবে সে। ঐদিনই রাত আটটার দিকে মোক্তার সাহেব লোক মারফত এরতাজ উদ্দিনকে ডেকে পাঠান। নানা ভর্ৎসনা করার পর জানান – লতিফাকে বিয়ে করতে হবে।

জানা যায় – লতিফা তার মাকে জানিয়েছে যে, তার গর্ভে এরতাজউদ্দিনের সন্তান। লজ্জা থেকে বাঁচতে মোক্তার সাহেব উন্মীলিত, শেকড়হীন মানুষটার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দেন। তবে লতিফা মিথ্যাটি বলেছে এরতাজউদ্দিনকে পাওয়ার জন্যেই। এরপর শ্বশুরবাড়িতে তাদের কষ্টের দিন শুরু হলো। সকলেই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করলো। শেষে চুরির অপবাদ দিয়ে বাড়িছাড়া করলো দুজনকে।

তারপর লতিফা-এরতাজউদ্দিনের জীবন হয়ে ওঠে আরও কষ্টের। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জীবন হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। লতিফার গর্ভে দুটি সন্তান জন্মে পর পর। কিন্তু সন্তান দুটিকে সে নিজেই মেরে ফেলে। লতিফা এক্ষেত্রে যে কৌশলটি নিয়েছিল তা হলো তার স্বামী ও এলাকাবাসীর চিরায়ত বিশ্বাস।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৬৭৫

‘জিন-কফিল’ তার সন্তানদের পৃথিবীতে আসতে দেবে না – এমন প্রচার করেছে লতিফা। নিজেই জিনেধরা রোগীর মতো অভিনয় করেছে। পুরুষালি গলায় স্বামীকেও ভয় দেখিয়েছে সে –

> তোরে আমি কিছু বলব না। তোর বাচ্চাটারে শেষ করব। তুই মৌলানা মানুষ। তুই বাচ্চা দিয়া কি করবি? তুই থাকবি মসজিদে। মসজিদে বইস্যা তুই তোর আল্লারে ডাকবি। পুলাপান না থাকাই তোর জন্য ভালো। হি হি হি।[১]

এ গল্পে নিপুণভাবে প্রবেশ করেছেন একজন মনস্তত্ত্ববিদ মিসির আলী। লজিক্যাল মানুষ মিসির আলী পৌঁছে গেছেন ধুন্দুলনাড়া গ্রামে। যুক্তি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন জিন-কফিলের নামে শিশু দুটির হত্যাকারী মূলত লতিফা। সে ঝোঁকের মাথায় এরতাজউদ্দিনকে বিয়ে করলেও পরবর্তী জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। চরম দারিদ্র্য লতিফাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। ফলে এরতাজউদ্দিনকে এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের কাউকে সে আর সহ্য করতে পারেনি। তবে মিসির আলী সাহেবের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয় লতিফা। ধীরে ধীরে সে সুস্থ জীবনে প্রবেশ করে। গল্পটি একটু দীর্ঘ। তবে নাটকীয়তা আছে প্রচুর। ডিটেক্টিভ গল্পের স্বাদ আছে এতে।

নিম্নবিত্ত মানুষের সন্তান হারানোর গল্প ‘নয়া রিকশা’। জাহেদা ও কুদ্দুসের একমাত্র সন্তান জাহেদুর রহমান। রিকশাচালক কুদ্দুস নামের শেষে জুড়ে দিয়েছে ‘খান’। তার ধারণা এতে নামের মধ্যে ‘স্পীড’ এসেছে। অন্যের রিকশা ভাড়ায় চালায় সে। তার স্বপ্ন– একদিন একটি নতুন রিকশা কিনবে সে। তখন এক বেলা রিকশা চালাবে আরেক বেলা ছেলেকে নিয়ে খেলবে। জাহেদুর রহমান খানের মা আবার সিনেমা-পাগল মানুষ। নায়ক মান্না তার অতি পছন্দের। সে প্রায়ই এফডিসির গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। নায়ক-নায়িকাদের একটু দেখার জন্য। একদিন ফরিদা নামের এক মহিলা জাহেদার কাছে এসে জানালো তার শিশুটিকে সিনেমার একটি দৃশ্যের জন্য অভিনয় করতে দিতে হবে। বিনিময়ে পাঁচশ টাকা দেওয়া হবে। মান্নার ছোটবেলার ভূমিকায় অভিনয় করবে শিশুটি। জাহেদা শিশুটিকে দিয়ে দেয় দুই ঘন্টার জন্য। পাঁচশ টাকা পেলে সে ছেলের জন্য একটি টেবিল ফ্যান কিনবে। গরমে তার ছেলেটি ঘুমাতে পারে না।

শুটিং এ অতিরিক্ত ভ্যাসলিন মাখার কারণে দশ দিনের শিশু জাহেদুর রহমান খান অভিনেতার হাত থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয় হার্ট এ্যাটাক। ‘ঝামেলা’ মেটানোর জন্য দশ হাজার টাকায় শিশুর বাবা-মায়ের সাথে সিনেমার লোকদের দফারফা হয়। তারা নতুন রিকশা ক্রয় করে। টেবিল ফ্যানটি চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস দিলেও জাহেদার হৃদয়ের উত্তাপ কমে না। নিম্নবিত্ত মানুষের অসহায়ত্বের ছবি ও মাতৃত্বের চিরায়ত দিকটি উন্মোচন করেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২২২।

ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার একটি খণ্ডিত চিত্র আছে 'শিকার' গল্পে। প্রান্তিক মানুষের জীবন-সংগ্রাম, তাদের হার না-মানা মানসিকতা এবং সর্বোপরি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনগাথা আছে এ গল্পে। গল্পের নায়ক আজরফ। এ অঞ্চলের মানুষের শখ ও জীবিকা পাখি শিকার। বিভিন্ন কৌশলে পাখি ধরে এ অঞ্চলের মানুষ। ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরেও হুমায়ূন আহমেদ পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন এক অচেনা জগতে। গল্পটিতে আছে টান টান উত্তেজনা। এ গল্পের শিকারি আজরফই একসময় শিকারে পরিণত হওয়ার চমকপ্রদ ঘটনায় উপস্থাপিত হয়েছে জীবন সত্যের অপূর্ব দর্শন।

বক শিকারি আজরফ তার পোষা বক অনুফাকে নিয়ে যায় বক শিকারে। পথে মতি মিয়া আজরফকে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দেয় উপদেশের সুরে। মতি মিয়ার চোখ দুটি কীভাবে বিনষ্ট হয়েছিল সে ইতিহাসও বর্ণনা করে আজরফকে। 'পাখি মারার চোখ না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারে না'– মতি মিয়ার একথা শুনেই হয়তো আজরফ এক সময় পোষা বক অনুফাকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু অনুফা যায় না। এবার অনুফা ডাকতে থাকে তার সগোত্রীয়দের। ঝাঁকে ঝাঁকে বক নেমে আসে নিচে। আজরফ তাকিয়ে দেখে। সে নড়ে না। এবার নিশ্চয়ই শিকার ও শিকারির রূপান্তর ঘটবে। মানুষের আদিম শিকারের নেশায় আজরফ মগ্ন হয়ে থাকে নির্ভীক, নির্বিকার হয়ে। নিয়তিতাড়িত এসব মানুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। আবার প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে নিজেদের প্রয়োজনেই। ফলে প্রকৃতিও যেন কখনো কখনো বিরূপ আচরণে মেতে ওঠে। প্রকৃতি হয়ে ওঠে প্রতিশোধ পরায়ণ।

'চোখ' গল্পে ডাকাত মতির চোখ উপড়ে ফেলা নিয়ে গ্রামের মানুষের আগ্রহের সীমা নেই। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ডাকাত মতির চোখ তোলে ফেলার গল্পটি এগিয়ে চলে। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের মায়াবী স্পর্শে গল্পটি হয়ে ওঠে মানবিক দলিল। মতি অপেক্ষ করে মানুষের– যিনি রক্ষা করবেন তার চোখ জোড়া। হুমায়ূনের মূল আরাধনা মানবতার অন্বেষণ।

হুমায়ূন আহমেদের প্রান্তিক চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়– নিম্নবিত্তের প্রতি লেখকের সহজাত দরদ আছে। নিয়তিতাড়িত এইসব প্রান্তিক মানুষ প্রায়ই নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত। হুমায়ূন আহমেদের প্রান্তিক মানুষেরা জীবন যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট নয়। জীবনের প্রতি তাদের অপার আগ্রহ আছে। প্রকৃতির সাথে এইসব মানুষের আছে নিবিড় সম্পর্ক। নিম্নবিত্ত এইসব মানুষের জীবন জুড়ে আছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা। এদের কেউ কেউ শঠতার মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করে। হুমায়ূন আহমেদের প্রান্তিক মানুষেরা সঙ্ঘবিমুখ। গল্পে সামবায়িক জীবনচর্চার চিত্র নেই। নিঃসঙ্গ মানুষের ছবি তিনি এঁকেছেন অনবদ্যভাবে। বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছায় হুমায়ূনের প্রান্তজনেরা উন্মুখ। মর্ত্যপ্রেম তাদের প্রবল। হুমায়ূন আহমেদের গল্পে নারী চরিত্রসমূহের গতিশীলতা তুলনামূলক কম হলেও প্রান্তিক নারীর জীবনসংগ্রাম বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্ক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হুমায়ূন আহমেদের গল্পে নর-নারীর সম্পর্ক

বাংলা সাহিত্যে 'প্রেম' একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ। 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে একালের সাহিত্যে প্রেমের বহুমাত্রিক স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। নর-নারীর প্রেমের বিচিত্র আখ্যান নির্মিত হয়েছে বাংলা কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটকে। রবীন্দ্রযুগ, রবীন্দ্রোত্তর যুগ, বিভাগোত্তরকালের শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁদের সাহিত্যকর্মে প্রেমের জয়গানেই মুখরিত। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে, বিশেষত ছোটগল্পের কাহিনি নির্মাণে প্রেমকে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

হুমায়ূনের ছোটগল্পে দু ধরনের প্রেমসম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়–

ক. বিবাহ-পূর্ব প্রণয় সম্পর্কের গল্পঃ রূপা, একটি নীল বোতাম, সাদা গাড়ি, বীনার অসুখ, সঙ্গিনী, শঙ্খমালা, লিপি, ভালোবাসার গল্প, গোপন কথা, আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ, পাথর, শাহ মকবুল, একজন ক্রীতদাস।

খ. দাম্পত্য জীবনকেন্দ্রিক প্রেমের গল্পঃ অসময়, রহস্য, অচিনবৃক্ষ, নিশিকাব্য, বেয়ারিং চিঠি, মিস মনোয়ারা।

হুমায়ূন আহমেদের 'রূপা' মিলনাত্মক প্রেমের গল্প। কুড়ি বছর আগে ঘটে যাওয়া এক ভ্রান্ত প্রেমের গল্প বিশেষ দিনে অপরিচিত কাউকে বলে বেড়ান চল্লিশোর্ধ এক ভদ্রলোক। রেলস্টেশনে লোকটির সঙ্গে দেখা হয় লেখকের। চমৎকার ভঙ্গিতে 'ইন্টারেস্টিং গল্প'টি লেখককে শোনান তিনি। কুড়ি বছর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণিতে পড়ুয়া সুদর্শন যুবক একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন। কেমিস্ট্রির সাবসিডিয়ারি ক্লাসের সুবাদে দুজনের পরিচয়। গল্পকথকের বর্ণনায় মেয়েটির রূপ অপরূপ, প্রেমে পড়ার মতোই– মিষ্টি চেহারা। দীর্ঘ পল্লব। ছায়াময় চোখ। সেই চোখ সবসময় হাসছে।

প্রথম দিন মেয়েটিকে দেখেই গল্পকথকের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। অনামা অস্থিরতায় তিনি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হতো অতি অল্প সময়ের জন্য– সপ্তাহে দুদিন। 'মেয়েটি খুব ক্লাস ফাঁকি দেয়' বলে কোনো কোনো সপ্তাহে দেখাও হতো না। তখন তার মনে হতো– লাফ দিয়ে মহসিন হলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে।

রূপা নামের রূপবতী মেয়েটি ভার্সিটিতে আসতো মরিস মাইনর গাড়িতে করে। একতরফা প্রেমের যন্ত্রণায় যুবকটির পরবর্তী দুটি বছর কাটলো নানামাত্রিক জটিলতায়। একদিন তিনি অসীম সাহসের কাজটি করে ফেললেন– মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে জেনে নিলেন রূপা নামক

মেয়েটির বাড়ির ঠিকানা। গল্পটি চমৎকার বাঁক নিয়েছে এর পরের ঘটনায়। আখ্যানের আকস্মিকতা যেমন ছোটগল্পকে শৈল্পিক উৎকৃষ্টতায় পৌঁছে দেয়, হুমায়ূন আহমেদের প্রায় গল্পেই তেমন আকস্মিকতার সন্ধান মেলে।

মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য যুবক তার বাড়ির সামনে 'আমরণ অনশন' শুরু করে। নিতান্তই পাগলের কাণ্ড। তার এই অনশনকে ঘিরে বাড়িতে দেখা দেয় নানা সঙ্কট। একসময় মেয়েটি তার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং অসম্ভব কোমল গলায় ছেলেটির পাগলামির কারণ জানতে চায়।

মেয়েটিকে দেখে এবার যুবকটির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এই মেয়ে তো সেই মেয়ে নয়। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভার তাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছিল ইচ্ছে করেই। যুবকটি কড়া নেড়েছে ভুল দরজায়। যুবকটি তার ভুলের কথা মেয়েটিকে বলতে চাইল কিন্তু যে গভীর ভালোবাসায় হাত বাড়ালো সে ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি।

ফলে ভ্রান্ত মানুষীকে নিয়েই গড়ে উঠল তার সত্য-পরিণয়। কুড়ি বছর কেটে গেলো কিন্তু আজো মেয়েটি সে কথা জানতে পারেনি। মানব জীবন কতই না বিচিত্র! দাম্পত্যজীবনে কাছাকাছি, পাশাপাশি থেকেও কত অজানা আখ্যান জমে থাকে মানুষের হৃদয়পটে। এরই নাম মানুষের পৃথিবী।

নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্তের অনবদ্য প্রেমের আখ্যান 'একটি নীল বোতাম'। একতরফা প্রেমের গল্প এটি। অতি দরিদ্র, শিক্ষিত এবং প্রায় বেকার যুবক রঞ্জু। সামান্য বেতনে এ্যাড ফার্মে চাকরির সুবাদে পরিচয় হয় নাগরিক উচ্চবিত্তের কন্যা এশা নামের এক মেয়ের সঙ্গে। রন্‌জুর ধারণা এশাদের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান তার চেয়ে বেশি বেতন পায়। কিন্তু বিত্ত-বৈভবের অহঙ্কার এশা কিংবা এদের বাড়ির কারো মাঝেই নেই। ফলে কোনো প্রয়োজন ছাড়াও রঞ্জু এশাদের বাড়িতে আসে অনায়াসে। এ বাড়ির মানুষদের সহজ-সুন্দর ব্যবহারে রঞ্জু মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

এশার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর রঞ্জুর মধ্যে বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে অকারণে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতে এখন আর তার ভালো লাগে না। মেয়েদের নিয়ে কেউ কুৎসিত কথা বললে আগে মজা লাগতো এখন মনে হয় কোনো ভাবে যেন তা এশাকে স্পর্শ করছে। মেসের খুপড়ি ঘরটা এখন আর ভালো লাগে না। নোনাধরা বিশ্রী দেয়াল দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রঞ্জু, আর ভাবে – 'আমার এই জীবনটা আমি কি কিছুতেই বদলাতে পারি না'?

এশা নামের মেয়েটির প্রতি তীব্র ভালোবাসা রঞ্জুর মানসিকতায় পরিবর্তন এনেছে। তবে অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর হয় না বলে বাহ্যিক পরিবর্তনটি যেন অসম্ভবই মনে হয়। তবু সুন্দর জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় তার। নাইট সেশনে এম.এ-তে ভর্তি, ধার করে ঘরের জন্য নতুন পর্দা, নেটের মশারি, ফুলদানি ক্রয় – এসব হয়ে ওঠে রঞ্জুর সুন্দর জীবনের প্রাথমিক উপকরণ। পুরনো বন্ধুদের প্রতিও রঞ্জুর আগ্রহ কমে যায়। তার সমস্ত চৈতন্যজুড়ে থাকে এশা আর তার

রুচিবোধ, সৌন্দর্য এবং কল্পনায় ভাসতে থাকে সাদা-কালো আর ঝঞ্ঝাটে ভরা মিথ্যে কথার শহরে এশা-রঞ্জুর লাল-নীল সংসার। রঞ্জু এশাকে ভালোবেসেছে একতরফাভাবেই। তার এই অসম প্রেমের কথা এশা কোনোদিন জানতেও পারেনি। কল্পনায় রঞ্জুর কল্পলোকে এশারই উপস্থিতি নিরন্তর:

> চৈত্র মাসের গরমে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। নানান রকম কল্পনা মাথায় আসে। কল্পনায় আমার এই ঘর হয়ে যায় পদ্মা নদীর নৌকায় একটা ঘর। জানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়েছে। চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। আমি জানি কে টোকা দিচ্ছে। তবু কাঁপা গলায় বলি, কে? এশা বলে, কে আবার? আমি। এরকম চমৎকার রাতে আপনি ঘর টর বন্ধ করে বসে আছেন? পাগল নাকি? আসুনতো।[১]

রঞ্জু এশাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতো নতুন নতুন বই ধার নেয়ার উছিলায়। যদিও বই পড়তে তার ভালো লাগে না। একদিন রাতে বই উল্টাতে গিয়ে একটি নীল বোতাম পায় রঞ্জু। সেই নীল বোতামটিকে এশার দেওয়া একটি নীল অপরাজিতা ভাবতে বেশ লাগে তার।

সেদিনও রঞ্জু এশাদের বাড়িতে যায়। উৎসবের আমেজ চারদিকে। এশার বিয়ে ঠিক হয়েছে আরেক ধনাঢ্য ব্যক্তির ছেলের সঙ্গে। কী সুন্দর করেই না এশা আজ সেজেছে। সে হাসিমুখে বলল– 'বেছে বেছে আপনি ঝামেলার দিনগুলিতে আসেন কেন বলুনতো?'

এই পরিবারটির কাছ থেকে একটা নীল বোতামের বেশি পাওয়ার যোগ্যতা যে রঞ্জুর নেই– এই সহজ কথাটি আজও তার মাথায় ঢুকবে না। আজো সে এটিকে ভাববে নীল অপরাজিতা। এ গল্পের ভাষ্যটি সমকালীন বিভ্রান্ত মধ্যবিত্ত জীবন-যন্ত্রণার এক গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান। ক্ষমতাহীন-বিত্তহীন প্রান্তিক মানুষ তীব্র আবেগে কেন্দ্রের সাথে মিশতে চাইলেও অর্থ সংকটের অদৃশ্য দেয়াল স্বপ্নবিলাসী মানুষকে বদলাতে দেয় না। তারা বেঁচে থাকে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে।

উত্তমপুরুষে লেখা গল্প 'লিপি'। গল্পের নায়কের নাম এরিখ স্যামসন। এ গল্পের পটভূমি প্রেম বিষয়ক জটিলতা এবং ভৌগোলিক বিচারে এর পট-পরিপ্রেক্ষিত বাংলা অঞ্চলের বাইরে। লেখক তখন আমেরিকায় পিএইচডি করছেন। এরিখ প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে পারদর্শী, এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্বের খোঁজ করতে গিয়ে লেখক সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর কয়েকটি চিঠি চালাচালির মাধ্যমে লেখক ও এরিখের মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠে। গল্পে হুমায়ূন আহমেদ নিজেকে যুক্ত করেন চমৎকার কৌশলে। এতে অবশ্য এক ধরনের সুবিধা হয়। পাঠক মনে করে গল্পের কাহিনি বানোয়াট নয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক বাস্তবতার স্বাদ ও বিশ্বাস নিয়ে গল্পে প্রবেশ করে।

এরিখ যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো সেখানে ক্যারোলিন নামের একজন মেয়েও পড়তো। ক্যারোলিন ছিল এরিখের ক্লাসমেট এবং অসাধারণ মেধাবী; রূপবতীও বটে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২২।

আমেরিকান ছেলেরা অতি স্মার্ট (মেধাবী অর্থে) তরুণী পছন্দ করে না। ফলে ক্যারোলিনের সঙ্গে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীর দূরত্ব ছিল। ঘটনাচক্রে একদিন এরিখ ও ক্যারোলিনের কথা হয়। এরিখ তাকে বলে –

> তুমি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছ না। তুমি তো ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া কোনদিকে তাকাওনা। আমি যেহেতু ব্ল্যাকবোর্ড না, আমাকে চেনার কথাও না।[১]

উত্তরে ক্যারোলিন যা বলেছে তাতে এরিখের বিস্ময়ের অবধি থাকে না–

> আমি তোমাকে চিনি। তোমার নাম এরিখ। তুমি গতকাল একটা নীল ব্লেজার পরে ক্লাসে এসেছ। তার আগের দিন ইয়েলো স্ট্রাইপের ফুলহাতা সার্ট পরেছ। তার আগের দিন সাদা জাম্পার ...।[২]

এরপর মেয়েটিকে 'ডেটিং'-এ নিমন্ত্রণ না জানিয়ে থাকা যায় না। এরিখ ভয়ে ভয়ে প্রস্তাবটি দিলেও ক্যারোলিন 'না' বলেনি। কান্ট্রি কিচেন রেস্তোরাঁয় সেদিনই সন্ধ্যা সাতটায় ক্যারোলিনের জীবনের প্রথম 'ডেটিং' সম্পন্ন হয়। জানা গেলো ক্যারোলিন বড় হয়েছে হোমে। তার মা-বাবা কে তা সে জানে না। জীবনে প্রথম সে 'ডেটে' এসেছে। এরিখের মতো 'Softly' কোনো ছেলে ইতঃপূর্বে তার সাথে কথা বলেনি। এরিখের ভাষ্য–

> আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। ডিনারের মাঝামাঝি এসে আমার মনে হলো, মেয়েটি সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে না থাকলে আমি বাঁচব না। আমি আমার বাকি জীবন এই মেয়েটির লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব।[৩]

অবশেষে এরিখ ও ক্যারোলিনের বিয়ে হয়। তাদের দাম্পত্য জীবন হয়ে ওঠে সুখময়, প্রেমপূর্ণ:

> মাঝে মাঝে রাতে ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখতাম। ঘুম ভাঙলে কী করতাম জানো? ক্যারোলিনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তার ঘুম ভাঙাতাম না। শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে জেগে থাকতাম।[৪]

কিছুটা পাগলামি ক্যারোলিনের মধ্যেও ছিল। তার মতো অসাধারণ মেধাবী পড়ালেখা ছেড়ে দিল। যুক্তি হচ্ছে, পড়াশোনা চালিয়ে গেলে এরিখের দিকে নজর দেওয়া হবে না। বিয়ের একবছর আট মাসের সময় ক্যারোলিনের ক্যান্সার ধরা পড়ে। একসময় রোগটি তার মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ানক রোগযন্ত্রণা থেকে বাঁচানোর জন্য এরিখ একসময় চার্চে গিয়ে ক্যারোলিনের মৃত্যু প্রার্থনা করতো। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একটি কাগজে ক্যারোলিন সাংকেতিক ভাষায় একটি চিঠি লিখে যায় এরিখের কাছে। হয়তো তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল কিংবা যা লেখা আছে তা নেহায়েতই আঁকিবুকি।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫৭৫।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫৭৫

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫৭৭

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫৭৮

এই লেখার রহস্য উদ্ধার করতে গিয়েই যেন এরিখের জীবন কেটে যায়। ক্যারোলিনকে হারানোর কষ্ট ভুলে থাকতে পারে সে। একুশ বছর থেকে এরিখ সে লিপির পাঠোদ্ধারে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরিখ ক্লান্তিহীনভাবে কেবল এ কাজটি করছে। কারণ –

> আমার মনে হয় ক্যারোলিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লাজুক ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে আমি তার রহস্য ভাঙার চেষ্টা করছি কি না। হাল ছেড়ে দিচ্ছি কিনা।[১]

অতঃপর লেখক দেশে ফিরে আসেন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর অনুরোধে এরিখের একটি চিঠি আসে এদেশের ঠিকানায়। প্রাপক তিনি নিজে। এরিখের আইনজীবী জানাচ্ছেন নিউমোনিয়ায় মারা গেছেন এরিখ। মৃত্যুশয্যায় ক্যারোলিনের চিঠির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হয়েছে এরিখ। সেই সাংকেতিক ভাষার প্রতিলিপি পাঠকের কাছে না পৌঁছলেও পাঠক সে লিপির ভাষা বুঝতে পারে হৃদয় দিয়ে। আমেরিকানদের ভালোবাসা সম্পর্কে বাঙালির মনে যে সন্দেহ আছে তা যেন 'লিপি' গল্প পাঠের পর ক্রমশ দূরীভূত হয়। প্রেমে তাদের অনুভূতিগুলো হালকা নয় বরং তাতে আছে অতলস্পর্শী গভীরতা। মূলত জগতের সকল প্রান্তের প্রেমই নির্মিত হয় অতল গভীরতা দিয়েই।

পরিণতিহীন এক ব্যর্থ প্রেমের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে শহরের এক বেকার যুবকের জবানিতে। পারুল নামের এক মেয়ের সঙ্গে প্রণয় এবং তারই সূত্র ধরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় এই যুবক। কিন্তু পারুল নির্দিষ্ট দিনে সময়মতো আসেনি। অপেক্ষমান যুবক 'চোখে জল আসবার মতো কষ্ট' নিয়ে বাসায় এসে পারুলের একটি চিরকুট পেল – 'সন্ধ্যায় ৬৯৭৬২১ নম্বরে ফোন করো, পারুল।'

পারুলের না আসার কারণ সম্পর্কে জানা গেল সে কিন্ডারগার্টেনের মাস্টারিটা পেয়ে গেছে।

বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে বলছে সে। 'মেয়েগুলি বড্ড খেয়ালি হয়'– যুবকের এই ধারণা আপাত সঠিক মনে হলেও কার্যকারণ অনুসন্ধানে জানা যায় পারিবারিক জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতাই যেন তাকে 'খেয়ালি' হতে বাধ্য করেছে। গল্পে পারুলের ব্যক্তিগত জীবন ওঠে আসেনি। তিনশ টাকার সামান্য স্কুল মাস্টারির চাকরিটাই তাকে অনেকটা আত্মবিশ্বাসী আর অহংকারী করে তুলেছে। অভাবী সংসারে পারুলের ওই সামান্য টাকাগুলো হয়তো অনেকগুলো প্রাণের রসদ জুগিয়েছে। ব্যক্তিগত প্রেম তুচ্ছ হয়ে গেছে পারিবারিক দায়বদ্ধতার কাছে। লেখক পারুলের এই দায়বদ্ধতার চিত্রটি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। হুমায়ূন আহমেদ চরিত্রের সবকথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন না সত্য কিন্তু দু-একটি সংলাপে অনেক না-বলা কথাকে বলে যান গভীরতর ব্যঞ্জনায়। পারুল ও যুবকটির প্রেম পরিণতি পায়নি। এর কারণ হিসেবে গল্পে যুবকটিই কিছু দুর্ঘটনার উল্লেখ করেছে।

[১] গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫৭৮।

যেমন –

> সে বছর আরও অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটল। ইরফানের কাছে আমার চার হাজার টাকা জমা ছিল। সে হঠাৎ মারা গেল। রামগঞ্জে এক ওয়াগন লবণ বুক করেছিলাম। সেই ওয়াগনটি একেবারে উধাও হয়ে গেল। পাথরকুচি সাপ্লাইয়ের কাজটায় বড় রকমের লোকসান দিলাম। ভদ্রভাবে থাকবার মতো পয়সাতেও শেষ পর্যন্ত টান পড়ল। মেয়েরা বেশ ভালো আন্দাজ করে। পারুল সত্যি সত্যি আমার ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলেছিল। পারুলের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল।[১]

কোনো এক এপ্রিলের তেরো তারিখে পারুলের বিয়ে হয়ে গেল। সে রাতে নষ্ট প্রেমিকের মতো যুবকটি সারা রাত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকেনি কিংবা দলবল নিয়ে মেয়ের বাড়িতে হামলা চালায়নি। অত্যন্ত শান্ত ও ধীরস্থির ভাবেই আরও অন্যান্য রাতের মতোই সে কাটিয়ে দিয়েছে সারারাত। এ যেন নিয়তিকে অনায়াসে মেনে নেওয়া। সন্ধ্যায় ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে খেয়ে অনেকদিন পর সিনেমাও দেখেছে ঐ দিন। বন্ধুর সাথে হৃষ্টচিত্তে বসে গল্প করেছে সে। তবু বিষণ্নতা যেন কাটেনি –

> সে রাতে ঘরের বাতাস আমার কাছে উষ্ণ ও আর্দ্র মনে হতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম ব্যবসার অবস্থাটা আর একটু ভালো হলেই একটি সরল দুঃখী দুঃখী চেহারার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলব। এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পারুলের হৃদয়হীনতার গল্প করতে করতে হা হা করে হাসব।[২]

কিন্তু যুবকের পরবর্তী অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। নিষ্ঠুর ও নির্দয় শহরে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চেনা লোকদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে লাগল সে। দাড়ি রাখল, হাঁটা পরিবর্তন করল। পারুলের সঙ্গেও দু-একবার দেখা হল। যুবকটি পাশের গলিতে পালিয়ে নিজেকে আড়াল করল কয়েকবার।

পারুলের সাথে স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা মনের গহীনেই হারিয়ে যায় বর্তমানের দৈন্যদশা অথবা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার অন্তরালে যখন যুবকটি তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকটা নিশ্চিত তখনি সে পারুলকে নিয়ে নবতর ভাবনায় সমর্পিত হয়। তার প্রতি পারুলের প্রেম যে কতটা গভীর ছিল তার মনোভাবনাই স্পষ্ট হয়ে উঠল –

> পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।[৩]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৮৯

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৮৯

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৯২

ভালোবাসায় করুণা মিশ্রিত থাকলে তার গাঁথুনি বড় শক্ত হয়। পারুল তার প্রেমিকের জীবনের খররৌদ্রে জলকণা হয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি, তবে সে তার অন্তর্লোকে করুণার যে আলোড়ন তুলেছে তাতে নায়কের সকল ব্যর্থতার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তাকে হারানোর বেদনা। গল্পটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের ছায়া আছে।

মনের গহিনে জন্ম নেওয়া অব্যক্ত প্রেমের গল্প 'গোপন কথা'। মঞ্জু ভালোবাসে নীলুকে। মঞ্জুর বন্ধুর ছোট বোন নীলু। সে অনার্স ফাইনাল বর্ষের ছাত্রী। মঞ্জুর প্রেম একমুখী। সে নীলুকে তার ভালোবাসার কথাটি বলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনের অপেক্ষায় ছিল। দিনটি তার জন্মদিন, এগারোই বৈশাখ। অবশ্য এরও পূর্বে আরেকটি আনন্দের উপলক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল। মঞ্জু কৃষি ব্যাংকের ফিফথ অফিসার পদে একটি চাকরি পেয়েছে। জীবনের মোটামুটি একটি নিরাপত্তা যখন তৈরি হয়েছে তখনই মঞ্জু তার গোপন কথাটি নীলুকে জানাতে চাইলো। প্রকৃতিও ছিল সেদিন চমৎকার –

> আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। এখনো অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে। আকাশে ক্ষীণ আলো-আঁধারিতে মন অন্য রকম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।[১]

নীলুকে গোপন কথা বলার জন্য এরচেয়ে সুন্দর দিন আর হয় না। আবেগ আর উত্তেজনা নিয়ে মঞ্জু সন্ধ্যায় নীলুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো। মেসে এবং মেসের বাইরে নানা কুৎসিত ঘটনাকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে সকলকে ভালোবাসার চোখে দেখতে লাগল। আজ যেন সে মহিমগড়ের রাজকন্যা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে নীলুদের বাড়িতে যাবে। জগতের সকল কুৎসিত বিষয়কে তুচ্ছ করে দেখার দিন আজ। সেদিনের আনন্দঘন সন্ধ্যাটি কল্পনা করতে বেশ লাগে মঞ্জুর। মঞ্জুর মেসমেট লোকটি (বাকের সাহেব) কুৎসিত স্বভাবের। তবে মঞ্জু আজ তাকেও ভালোবাসতে চায়। বাকের সাহেব ঘুমালে মুখের লালায় তাঁর বালিশ ভিজে যায়। লুঙ্গি উঠে যায় কোমরে। নাক ঝেড়ে মশারিতে মুছেন তিনি। তাতে কিছু যায় আসে না। আজ তার চোখে অসুন্দর কিছু পড়বে না, বাকের সাহেবকেও সে ভালোবাসবে আজ। এমন দিনে পয়সা খরচ করতেও বেশ লাগে। এদিন নিউমার্কেট থেকে দামি শার্ট কেনা যায় যা অন্যদিন হলে বুকে বিঁধত। এমন দিনে দামি সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। গোপন কথা বলার দিনে টাকা অতি তুচ্ছ বিষয়। কাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যায় মঞ্জু ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নীলুদের বাড়ি পৌঁছল। সে দেখল– 'নীলু একটা শাড়ি পরেছে। পরার ভঙ্গিটির মধ্যে কিছু একটা আছে। তাকে বিলুর (নীলুর ছোট বোন) চেয়েও কম বয়স্ক লাগছে। যেন সিক্স-সেভেন পড়া বালিকা সখ করে শাড়ি জড়িয়েছে।'[২]

বিলুর হোম টিউটর এসেছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। দুবোন বসে ভূতের গল্প শুনছে। মঞ্জু এ পর্যায়ে তার ঢাকা ছেড়ে যাবার প্রসঙ্গটি বললো। ভূতের গল্প শেষ হতে অনেক অনেক সময় লাগলো। নীলু চা আনতে যাওয়ার সময় মঞ্জু উঠে দাঁড়াল –

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫,পৃষ্ঠা- ৪৪৩

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪৪৭

- তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।
- একবার তো বলেছেন।
- কী বললাম।
- কৃষি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন।
- এ কথা না। অন্য একটা কথা।
- ঠিক আছে বলবেন। দাঁড়ান স্যারের কাছে আরেকটা গল্প শুনি।[১]

এ গল্প শুনতে শুনতেই রাত বেড়ে গেলো। বৃষ্টিও কমে এলো। গোপন কথা গোপনেই থেকে গেলো। আলো ঝলমলে যে চমৎকার দিনটি শুরু হয়েছিল তা শেষ হলো লোড শেডিংয়ের অন্ধকার আর বৃষ্টিস্নাত ভ্যাঁপসা গরম দিয়ে। মেসের বাকের সাহেব বমি করে ঘর ভাসিয়ে ফেলেছেন – 'শরীরটা খারাপ করেছে ভাই। বমি হয়েছে কয়েকবার। একটু সাবধানে আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।'

কুৎসিত বাকের সাহেব, যার কাছে মঞ্জুর জন্মদিনের আবেদনে 'আম-কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন রে' বলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, সে পরম মমতায় এগিয়ে দেয় জন্মদিনের উপহার 'এক প্যাকেট সিগারেট'। 'গরীব মানুষ, কী আর দিব বলেন' – এই 'কুৎসিত' 'গরীব মানুষই' হয়ে ওঠে 'গোপন কথা' শোনার একমাত্র শ্রোতা।

নিম্নমধ্যবিত্ত যুবকের আলো ঝলমলে দিনটি আসলে মিথ্যা। 'থাকে শুধু অন্ধকার' আর মিথ্যা মহিমগড়ের রাজকন্যার অতিথি হয়ে যাওয়া। মহিমগড়ে রাজবাড়ির জীবন সত্য নয়, সত্য হলো নোংরা মেসজীবন আর তার মানুষগুলো।

'আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ' অসম প্রেমের গল্প । আকতার সাহেবের মেয়ের নাম মীরা। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকনোমিক্সে পড়ে। মীরাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায়ের। মীরা ভালোবাসে সওকত নামের এক বেকার যুবককে। প্রাইভেট টিউশনি করে কোনোমতে দিন চলে তার। মেসে থাকে সওকত। তার জন্মদিনে মীরা তাকে দুপুরে নিমন্ত্রণ করেছে তাদের বাড়িতে। বাবার সাথে গিয়ে নিজের পছন্দের অনেক প্রকারের মাছ কিনে এনেছে ধূপখোলা বাজার থেকে। নিজেই রান্না করেছে। রান্নার একটি আইটেম চিংড়ি। মীরার মা বিষয়টি জেনে হতভম্ব হলেন এজন্য যে তার মেয়ে এমন এক ছেলের প্রেমে পড়তে পারে, বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে পারে তাকে।

সুজিত নামের এক ছেলের সঙ্গে মীরার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে; সে ডাক্তার এবং FRCS ডিগ্রি নিয়ে এসেছে লন্ডন থেকে। সুজিতের বাপ-মার দেওয়া আংটিটি মীরা কেন পরছে না, তা এখন মীরার মায়ের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হল। মীরার মা তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং মেয়ের রুচি নিয়ে অনেক কটুকথা শোনালেন। মীরার বাবা যে এ সম্পর্ক কখনোই মেনে নেবেন না সে কথাটিও স্পষ্ট করে বোঝালেন তিনি। ফলে মীরার দেয়া নিমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করতে বলা হলো।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪৪৭

'আজ বাসায় একটা সমস্যা হয়েছে, অনেক লোকজন চলে এসেছে' – এই বলে মীরা সওকতকে পাঁচশ টাকা হাতে দিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে বসিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় দিল। অসম প্রেমের চিরাচরিত চিত্র এটিই। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ তাঁর যে-কোনো গল্পকে জাদুকরী স্পর্শে তুলে নিয়ে যান; নির্মাণ করেন গল্পের পরের গল্প যা শেষ হয়েও শেষ হয় না। নাটকীয় বাঁক নেয় তাঁর গল্পের কাহিনি। গল্পের শেষ দিকে দেখা যায়:

> তেহারি চলে এসেছে। মুরগির ঝাল ফ্রাইয়ের ঝোল এসেছে। পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, সালাদ, এসেছে। সওকত খাওয়া শুরু করবে, তখনই আফতাব ঢুকলেন।[১]

আফতাব মীরার বাবা। মেয়ের আমন্ত্রিত অতিথিকে নিজেই নিতে এসেছেন। এরপর মীরাদের খাবার টেবিলে সওকত। মানব-মানবীর প্রেমের চিরায়ত প্রেমের চাইতে বড়ো হয়ে ওঠে সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা। কন্যার ইচ্ছার মূল্য দেন পিতা। আর তখনই সব ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে মানবপ্রেম।

ব্যর্থ প্রেমের আখ্যান নিয়ে নির্মিত গল্প 'শঙ্খমালা'। এ গল্পটির কথক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছেলে ছোটন। ছোটনের অভিমানী বড় ভাই ভালোবাসতো পরী নামের এক মেয়েকে। ছোটনদের বাড়ির পাশেই পরীদের বাড়ি। পরীর বিয়ে হয়েছে অন্যত্র। সেখানে পরীর একটি কন্যা সন্তানও জন্ম নিয়েছে। পরী তার বাবার বাড়ি মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। সেদিনও এসেছিল। পরী যখনই বেড়াতে আসে ছোটনদের বাড়িতে তখনই শুরু হয় দুঃখের দিন।

এনড্রিন খেয়ে আত্মহত্যা করা ছোটনের বড় ভাইয়ের স্মৃতিগুলো যেন পরিবারের সকলের সামনে ভেসে উঠে। পরীর আগমন যেন ছোটনদের বাড়ীতে নিয়ে আসে দুঃসহ অতীতকে। মা আর অন্ধ বাবা যেন পুত্রশোকে অধিকতর দুঃখী হয়ে ওঠেন। কারণ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যই যেন দুঃখকে পুষে রাখা। দুর্ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করলে দুঃখবোধ যেন তীব্র হয়ে ওঠে –

> আমরা খুব দুঃখ পুষে রাখি। হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন আমাদের কত পুরানো কথা মনে পড়ে। বুকের ভেতর আচমকা ধাক্কা লাগে।[২]

ছোটনদের দুঃখের ধাক্কাটি যেন আরো তীব্র হয়ে উঠে পরীর হঠাৎ আগমনে। পরীর বিয়ে কেন ছোটনের বড় ভাইয়ের সাথে হয়নি সে বর্ণনা গল্পে নেই। সে কীভাবে মৃত্যুবরণ করল সে সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা নেই। পরীর সাথে তার প্রেম ছিল এবং বিয়ে হয়নি এ সত্যটুকুর আভাস পাওয়া যায় মাত্র। ঘনিষ্ঠ প্রেমের কোনো রসদও গল্পে নেই। গল্পটির গল্প অন্য জায়গায়। সেটি হলো পরিণতিহীন একটি প্রেমের দুর্বলতা অন্যদের কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে তা বলে যাওয়া। প্রেমের ব্যর্থতাকে মেনে না নিতে পারাটাও প্রেমেরই দুর্বলতা। 'যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' সে প্রেম যে প্রেম নয় এটি যেন গল্পের প্রতিপাদ্য।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৮৮০

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২২৭

এ গল্পে আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে আর তা হলো মৃত সন্তানের স্মৃতি-সন্ধান। ছোটনের বাবা মায়ের কোনো ঈর্ষা বা প্রতিহিংসা পরীর প্রতি নেই। বরং ছোটনকে পরীদের বাড়িতে পাঠানো হলো তার সাথে দেখা করতে। ছোটন ফিরে এলে বাবা জিজ্ঞেস করলেন– 'পরী কিছু বলেছে'? 'না' শুনে ছোটনের মায়ের শরীরটা কেঁপে ওঠে – 'একটি হাহাকারের মতো তীক্ষ্ম স্বরে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'আমার বড় খোকা, আমার বড় খোকা'।[১]

মূলত তারা কী চান? তারা হয়তো চান পরী তাদের বড় খোকার জন্য আফসোস করুক। যেহেতু তাকে না পেয়ে বড় খোকা আত্মহত্যা করেছে সেহেতু সে অনুশোচনায় দগ্ধ হোক। আবার এটাও হতে পারে যে, পরী স্মৃতির পাতা থেকে কোনো প্রসঙ্গ তুলে এনে তাদের বড় খোকার নামটা উচ্চারণ করুক। কিন্তু পরীর পক্ষে কোনো অনুশোচনা কিংবা স্মৃতির উল্লেখ করা কি এখন সময়োচিত? অবুঝ পিতৃমাতৃহৃদয় প্রায়ই বুঝতে চায়না যে, তাদের বড় খোকাকে তারা সারাজীবনই ভালোবাসবে; কিন্তু শঙ্খমালারা?– 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর'।

দাম্পত্য প্রেমের রহস্যময় আখ্যান 'রহস্য'। স্ত্রীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার স্বরূপটি চিত্রিত হয়েছে সামান্য বেতনের চাকরিজীবী এক স্বামীর বিচলিত মানসিকতার রহস্যময় কর্মতৎপরতায়। স্ত্রীর গুণমুগ্ধ ভদ্রলোকের বয়স তেমন নয়, কিন্তু তিনি অভাবে পর্যুদস্ত। চোখের দৃষ্টি ভরসাহারা। তাঁর স্ত্রী অল্প বয়েসী তরুণী এবং খুবই গুণবতী। স্ত্রী সাহিত্য সাধনা করে, শিল্পের চর্চা করে, গল্প লেখে, কবিতা লেখে, গানও জানে। ভদ্রলোকের ভাষায়– 'বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা'। কারণ তিনি মনে করেন, এরকম গুণবতী নারীর স্বামী হওয়ার যোগ্য নন তিনি।

ভদ্রলোকটি অত্যন্ত কৌশলী; তবে ধুরন্ধর নন। তিনি কৌশলে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন যাঁরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। সখ্য গড়ে তোলার এক পর্যায়ে তিনি তাঁদের নিয়ে যান তার বাসায়। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ডিসি থেকে শুরু করে অনেক গণ্যমান্য লোককেই তিনি বাসায় নিয়ে আসেন।

বাসায় আনার জন্য তিনি যে কৌশলটি অবলম্বন করেন তা হলো এই যে, তার বাসায় একটি তক্ষক আছে এবং সেটি রোজ রাত ১টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকে। ভদ্রলোকের নাছোড়বান্দা স্বভাবের কারণে অনেকেই মাঝরাতে তক্ষকের ডাক শুনতে যেতে বাধ্য হন। ১টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষার দীর্ঘ সময়টি তারা পার করেন লীনা নামের অল্প বয়েসী বধূটির গল্প, গান, কবিতা শুনে। অনেকেই হয়তো ১টা ২৫ মিনিটের পূর্বেই উঠে যান তক্ষকের ডাকের মতো রহস্যময় বিষয়টি বুঝতে পেরে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা- ২৭৯।

অভাবগ্রস্ত স্বামী তার স্ত্রীর গুণ প্রচার করতে আশ্রয় নেন মিথ্যার। অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার মেকি প্রতিযোগিতায় নিজেকে পণ্য করে তোলার মানসিকতা থেকে নয় বরং এক অসীম প্রেমের কারণেই গুণবতী স্ত্রীটির শৈল্পিক প্রতিভা বিকশিত হোক– এ কামনা থেকেই ভদ্রলোকটি এ রহস্যময় কৌশল অবলম্বন করে। তাই ভদ্রলোকের মিথ্যা কৌশলটিও মহত্ত্ব পায়, কারণ– 'আগুনে যেমন সব বিষ যায়, প্রেমেও তেমনি সকলি শুচি।'

গ্রামের সাধারণ মানুষের অসাধারণ প্রেমের গল্প 'অচিন বৃক্ষ'। ময়মনসিংহ অঞ্চলের এক গ্রামের মানুষের বিশ্বাস তাদের গ্রামে আছে একটি 'অচিন বৃক্ষ'। গাছটির বর্ণনা– 'মাঝারি সাইজের কাঁঠাল গাছের মতো উঁচু। পাতাগুলি তেঁতুল গাছের পাতার মতো ছোট ছোট। গাছের কাণ্ড পাইন গাছের কাণ্ডের মতোই মসৃণ।'[১]

তাদের মতে এ গাছের বয়স দুই হাজার বছরেরও বেশি। গাছটি নিয়ে আশেপাশের দু-চার গ্রামের মানুষের রয়েছে লৌকিক বিশ্বাস। কিছুদিন পর পর বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন এ গাছটি দেখতে। গ্রামের মানুষরা অতিথিদের আপ্যায়ন করে সাধ্যমতো। গাছটি নিয়ে গ্রামবাসীর আগ্রহের আতিশয্য ও অতিকথনের পরিসীমা নেই। যেমন –

– এই গাছের ফুল সর্বরোগের মহৌষধ।
– এই গাছের ফুল যেদিন ফুটবে সেদিন গ্রামের মানুষের আর দুঃখ থাকবে না।

অচিন বৃক্ষ দেখতে আসা মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয় গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে। লোকটির বয়স অল্প, তবে অল্প বয়সেই গালটাল ভেঙে একাকার। দেখেই মনে হয় জীবনযুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ। বেঁচে থাকতে হয় বলেই তিনি বেঁচে আছেন। তিনি বেঁচে আছেন জীবন যন্ত্রণার কষাঘাতে বিপর্যস্ত অবস্থায়। তাঁর স্ত্রী রেণু। প্রেমের বিয়ে তাঁদের। মেয়েটি মেট্রিক পাশ, শহরে বেড়ে উঠেছে। কবিতা লেখে সে। হার্টের বাল্বের সমস্যা তার। ডাক্তার বলেছে লাখ দুই টাকা খরচ করলে একটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে দুই লাখ টাকা খরচ করা দরিদ্র হেডমাস্টারের পক্ষে অসম্ভব।

অচিন বৃক্ষ দেখতে আসা বিশিষ্ট মেহমানরা রেণুর গুণ এবং রোগ সম্পর্কে জেনে যান। হেডমাস্টার সাহেবের পাগলামির খবরটিও অজানা থাকে না –

[১] গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩২৩

– এই মানুষটা পরিবারের জন্যে পাগল। সারা রাইত ঘুমায় না। স্ত্রীর ধারে বইস্যা থাকে। আর দিনের মধ্যে দশটা চক্কর দেয় অচিন বৃক্ষের কাছে।

– কেন?

– ফুল ফুটছে কিনা দেখে। অচিন বৃক্ষের ফুল হইল অহন শেষ ভরসা।[১]

স্ত্রীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা এবং নিজের দীনতা হেডমাস্টার সাহেবের মনে তৈরি করে বিভ্রম। সর্বসহায়হারা মানুষ বিশ্বাস করে অলৌকিকতায়। একদিন প্রকৃতিই সব ঠিক করে দেবে; এ বিশ্বাস বুকে লালন করেই বেঁচে থাকে প্রান্তিক মানুষেরা– 'অচিন বৃক্ষের ফুল ফোটারও বেশি বাকি নাই। ফুল ফোটার আগে পচা শ্যাওলার গন্ধ ছাড়ার কথা। গাছ সেই গন্ধ ছাড়া শুরু করছে। আর কেউ সেই গন্ধ পায় না। আমি পাই।'[২]

উত্তম পুরুষে লেখা গল্প 'অসময়'। গল্পকথকের স্ত্রীর নাম জরী। কোনো এক বিচিত্র কারণে জরী কখনো কারো প্রতি বিরক্ত হয় না। ফলে জরী তার স্বামীর গরিব আত্মীয়-স্বজনকে মোটেই অবহেলা করে না। যদিও সে বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। জরীর কোনো আত্মীয় পরিজন তার স্বামীকে মেনে নেয়নি বলে কখনো কেউ এ বাড়িতে আসে না। তবু জরী যেন সহায়-সম্বলহীন অল্প বেতনে চাকরি করা স্বামীর সংসারে সুখেই আছে। একটি চমৎকার দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের মাঝে। তাই গ্রাম থেকে অনবরত লোকজন আসতে থাকলেও জরী যত্ন সহকারে মেহমানদারি করে। গল্পকথক একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখেন –

> বসার ঘরের সোফায় হলুদ চাদর গায়ে দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে রগ-উঠা ময়লা পা বের হয়ে আছে। সোফার হাতলে যে গোলাকার দাগ তা ঐ পা থেকে এসেছে, বলাই বাহুল্য। রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।[৩]

কিন্তু লোকটিকে দেখার পর সেই রাগ আর রইলো না। এ হচ্ছে সেই হাসু চাচা যার বাড়িতে আশ্রিত থেকে গল্পকথক মেট্রিক পাস করেছিলেন। হাসু চাচা অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় এ বাড়িতে এসেছে। রাতে তার প্রচণ্ড জ্বর হলো। হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। হাসু চাচা জ্বরের ঘোরে তার মেয়ে মিনুকে ডাকতে লাগলো। শেষরাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় জরী তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো– 'মিনু কে'?

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩২৮

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩২৮

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৫১

মিনু হাসু চাচার মেয়ে, যে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় মারা গিয়েছে। গল্পকথক আর কিছু বলেনি। জরীর একটি মাত্র বাক্যেই পাঠক সমস্ত অতীত পড়ে ফেলে মুহূর্তেই– 'অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ বলল, 'মাঝে মাঝে' তুমি যখন আমাকে খুব আদর করো তখন কিন্তু আমাকে 'মিনু' ডাকো।'[১]

প্রেমময় দাম্পত্য জীবনে অসময়ে চলে এসেছে মিনু নামের কিশোরী। তবে গল্পে তাকে দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। হুমায়ূন আহমেদের গল্প বলার কৌশলে আছে পরিমিতিবোধ। একটি মাত্র বাক্যে জীবনের প্রথম প্রেমের ছবি অনেক কথার মালা হিসেবে নির্মিত হয়েছে। অসময়ে প্রেমের প্রসঙ্গটি এলেও দাম্পত্য সম্পর্কে তা কোনো প্রভাব ফেলেনি।

'সাদা গাড়ি' গল্পে প্রেম এসেছে ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে। উচ্চবিত্ত পরিবারের মায়োপিয়া ও হার্টের অসুখে জর্জরিত এক ছেলের নাম সাব্বির। পুরানা পল্টনে আকস্মিকভাবে সাব্বিরের সাথে পরিচয় হয় গল্প কথকের। সাব্বিরের শারীরিক গড়ন নিম্নরূপ –

> কোনো পুরুষ মানুষের এমন মেয়েদের মতো চেহারা হয় আমার জানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট। কাচবিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মতো ছোট্ট চিবুক।[২]

অসুস্থ সাব্বিরকে বাসায় পৌঁছে দেন গল্পকথক। এরপর থেকেই 'বিপত্তি'র শুরু। সাব্বির প্রায়ই গল্পকথকের বাসায় আসে। হয়তো সে কোনো চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে এমন সময় সাদা গাড়ি নিয়ে সাব্বির উপস্থিত। লজ্জিত মুখে অকারণ উপদ্রবের জন্য 'সরি' বলছে আবার দ্রুত চলেও যাচ্ছে।

সাব্বিরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে গল্পকথকের সুখ-দুঃখের কোনো মিল নেই। ফলে সম্পর্কটি 'আপনি' থেকে 'তুমি'তেও গড়ায়নি। আবার তাদের মধ্যে বন্ধুতাও হয়নি। তবু সাব্বির গল্পকথকের সাদামাটা জীবনটাকে হয়তো বা অনুভব করতো। যে ছেলেটি কখনো মেয়েদের সাথে সামনা-সামনি বসে কথা বলেনি সে-ই গল্পকথক ও নীলুর প্রেমময় সময়গুলোর গোপন সাক্ষী। সাব্বির যে গোপনে তাদের অনুসরণ করতো একথা সে আবার স্বীকারও করেছে অকপটে। আর মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটি আকুতিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছে – 'পৃথিবীর মানুষ এত সুখী কেন বলুনতো'?

গল্পকথক আর নীলুর সাক্ষাতের দিনগুলোতে সাব্বির যেন ছায়ার মতো লেগে থাকতো। তারা কোথায় যায়, কী কেনে, কী খায় – সবই সে দূর থেকে দেখেছে এবং পরে আবার তা স্বীকার করেছে। ফলে, নীলুর হাত ধরার চেয়ে গল্পকথকের বেশি মনোযোগ থেকেছে আশপাশের সাদা গাড়ি খোঁজার দিকে।

১. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৫৪

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৪৫

একসময় সাব্বিরের 'উপদ্রব' বন্ধ হলো। সে আর আসেনি। কেন আসেনি সে খোঁজও গল্পকথক আর নেয়নি। জানা গেল নীলুর সঙ্গে গল্পকথকের বিয়ে হয়নি। তবে যাকে সে বিয়ে করেছে তার জন্যও সে প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করে। তবে সাব্বির সশরীরে না এলেও তার উপস্থিতি যেন আজও গল্পকথককে বিব্রত করে –

> বৃষ্টির রাতে যখন হঠাৎ বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয় আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনি মনে হয় কাছেই কোথাও সাদা গাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা পরা অসুস্থ যুবক ভ্রু কুঁচকে ভাবছে, মানুষ এত সুখী কেন?[১]

মানুষের বেঁচে থাকার আকুলতা এবং জীবনের প্রতি গভীর আসক্তির কথাই এ গল্পের মূল উপজীব্য। সাব্বির নামের অসুস্থ ছেলেটির প্রবল আকর্ষণ সেখানে, জীবন যেখানে শিহরণ জাগায়। পারিবারিক আবহের বাইরেও জীবনে প্রেমসিঞ্চিত সমীকরণ প্রয়োজন যা আসে বন্ধুতা থেকে কিংবা একান্ত প্রিয়জনের কাছ থেকে।

অসম বয়সের প্রেমের গল্প 'পাথর'। এ গল্পের নায়িকা কিশোরী। চিত্রা নামের মেয়েটির ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হয়েছে সবে মাত্র। হাতে অখণ্ড অবসর। চিত্রাদের ছাদের চিলেকোঠায় ভাড়া থাকেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেয়া ইংরেজি সাহিত্যের এক অধ্যাপক, যিনি বিপত্নীক। একমাত্র মেয়েটি বরসহ থাকে বিদেশে। চিত্রা তাকে সম্বোধন করে জোবেদ চাচা বলে। জোবেদ সাহেব বিস্তর বই পড়েন, আর বিচিত্র বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখেন।

চিত্রা খুব সুন্দর করে মিথ্যা বলতে পারে। আবার চমৎকার অভিনয়ও জানে সে। তবে তার চেয়েও বড় অভিনেত্রী তার মা। সুরমা নামের মহিলাটি সংসারে বোকা সেজে থাকেন। ফলে জোবেদ আলীর প্রতি চিত্রার আগ্রহের বিষয়টি তিনি সহজেই ধরে ফেলেন। এরপরই চিত্রার মায়ের বিনিদ্র রজনী কাটতে থাকে।

চিত্রা জোবেদ সাহেবকে পছন্দ করতো, ভালবাসতো। জোবেদ সাহেবও চিত্রাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। একটি পাথরে গুণ চিহ্ন এঁকে দুজনের ভিন্ন পথ আবার এক বিন্দুতে মিলনের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। চিত্রাকে পছন্দের কথাটিও বলেছিলেন তিনি। অল্পবয়েসী চিত্রা ছিল আবেগী। জগতের সবকিছুতেই ছিল অনাবিল আনন্দ আর আগ্রহ। ভুল করার উপযোগী সময় এটি। ফলে চিত্রাও ভুল করলো। জোবেদ সাহেবকে ভালোবাসার ভুল।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৫১।

একদিন জোবেদ সাহেবের মৃতদেহ দেখা গেল আঙিনায়। 'আত্মহত্যা' বলে পুলিশকে সামাল দিল চিত্রার পরিবার। চিত্রার বিয়ে হলো। রুনি নামে একটি মেয়েও হলো। স্বামীর সঙ্গে চমৎকার দিন কাটছে তার। চিত্রার মেয়ে রুনি জোবেদ সাহেবের দেয়া সেই পাথরটি হাতে পেল একদিন। বিস্মৃত দিনগুলো এবং জোবেদ সাহেবের কথা চিত্রাকে নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত করলো। তবে চিত্রা আর ভুল করতে চায় না। জোবেদ সাহেব যেন চিত্রাকে বলছে – 'আমি পাথরের ভেতর বন্দি হয়ে আছি। পাথরটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেলেই আমি মুক্তি পাব।'

চিত্রাও মুক্তি চায়। যা হারিয়ে গেছে স্মৃতির অতলে তাকে আর জাগাতে চায় না। কিশোরী মনের ভুলকে আর প্রশ্রয় দিতে চায় না সে। আর তাই ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে পাথরটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে সে। টুকরোগুলো সেখানেই গিয়ে পড়ে, যেখানে পড়েছিলেন রক্তাক্ত জোবেদ সাহেব।

আর একটি সত্যও চিত্রা বুঝতে পেরেছে যে, জোবেদ সাহেব আত্মহত্যা করেননি তাকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিলেন মিসেস সুরমা; তার মা। আজ অবশ্য এজন্য তার মায়ের প্রতি কোনো অভিযোগও তার নেই। 'পাথর' গল্পের নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী। চিত্রার বয়েসী ছেলেমেয়েদের প্রেমময় আবেগ পাথরের মতোই নিশ্চল, কঠিন। আবার বয়সের পরিপক্কতায় সে আবেগ শতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়।

'শাহ মকবুল' গল্পে বিয়ের আসরে হতাহতের ঘটনায় বিয়ে ভেঙে যায় মকবুল-জাহেদার। এই ঘটনায় মামলা করেন বরযাত্রী উকিল অধর রায়; যার পা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে আরো দুইজন বরযাত্রীকে। মামলার প্রধান আসামীর বয়স বিবেচনায় জাহেদার দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন করা হয়েছে। জাহেদার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে মকবুল। তবে কোর্ট তাকে পাগল বলে সাব্যস্ত করেছে। আদালত তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি। শাহ মকবুল তাই বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে 'সে পাগল নয়' মর্মে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে। জাহেদার প্রতি তার ভালোবাসা অফুরন্ত। মাঝে মাঝেই সে কোর্টে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মতোই তারা কথা বলে। সন্তানদের নাম রাখা নিয়ে তাদের মধ্যে টুকটাক ঝগড়াও হয়। জাহেদা জেল থেকে বের হলেই সুখের সংসার করবে তারা। মকবুলের অপেক্ষা শেষ হয় না।

নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের প্রেমগাথা 'ভালোবাসার গল্প'। নীলু নামের এক মেয়ে ভালোবাসে বেকার যুবক রন্জুকে। রন্জু দুটি টিউশনি করে কোনোমতে বেঁচে আছে। নীলু ও রন্জুর প্রেমময় সময়গুলো কাটে শহরের সস্তা হোটেলের চায়ের টেবিলে। নীলুর বিয়ে ঠিক করেছে তার বড় ভাই। সে-ই সংসারের একমাত্র কর্মক্ষম। সুতরাং বাড়ির কর্তা সে। নীলুর মনে রন্জুর জন্য প্রচণ্ড ভালোবাসা। তবে সংসারের প্রতি, তার বড় ভাইয়ের প্রতিও আছে দায়বদ্ধতা। তাদের সম্পর্কের কথা নীলু তার ভাইকে বলতে পারেনি। চালচুলোহীন রন্জুও পারেনি নীলুর ভাইয়ের সামনে তার

প্রেমের দাবি নিয়ে যেতে। ফলে প্রেমের সমাধি রচনা করা ছাড়া নীলুর কিংবা রন্জুর অন্য কোনো উপায় থাকে না । চরম বাস্তবতার কাছে প্রেমের ইতি টানতে বাধ্য হয় তারা। চোখের জলে প্রেমের সমাপ্তি টানা ছাড়া নীলু-রন্জুর কী-ই বা করার আছে? পারিবারিক বন্ধন এবং বিত্তহীন পরিবারটির সম্ভ্রমের কথা বিবেচনা করে নীলু ভাইয়ের সিদ্ধান্তকে না মেনে পারেনি।

নর-নারীর প্রেমকে ছাড়িয়ে চিরায়ত মানবপ্রেমে রূপ নেওয়া গল্প 'বীণার অসুখ'। লালমাটিয়া কলেজে বি.এ সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী বীণা। মামার বাড়িতে থাকে সে। তার মামা ইদরিশ সাহেব গফরগাঁওয়ের এক ছেলের সাথে বীণার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন।

বীণা ছেলেকে দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়। ছেলেটির 'কেমন যেন পশু পশু চেহারা। সোফায় বসে ছিল দুই হাঁটুতে দু'হাত রেখে। মুখ একটু হা হয়েছিল। সেই হা করা মুখের ভেতর কালো কুচকুচে জিহ্বা।'[১]

লোকটার শরীরে ছিল অদ্ভুত গন্ধ। টক দুধ এবং পোড়া কাঠের গন্ধ একত্রে মেশালে যে রকম গন্ধ হয় সে রকম গন্ধ বীণার নাকে এসে লাগলো। এই লোককে বিয়ের প্রশ্নই আসে না।

ইদরিশ সাহেবও সেই গন্ধ পেয়েছেন। তিনি বিয়ে ভেঙে দিলেন। কিন্তু লোকটি বীণার পিছু ছাড়ল না। বীণা যেখানেই যায় লোকটিও সেখানেই উপস্থিত হয়। বীণার ভয় কাটে না। একসময় সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গ্রামে। বীণা স্বপ্নেও তাকেই দেখে। তার অসুস্থতা যায় বেড়ে। একদিন জানা যায় লোকটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। মৃত্যুর সময় বীণার মামা লোকটির সঙ্গে দেখা করে। বীণার বিয়ের সমস্ত খরচ দিয়ে যায় লোকটি।

লোকটির চেহারা কুৎসিত হলেও তার ছিল চমৎকার মানবিক একটি মন। বীণার মামার বর্ণনায় লোকটির উন্নত মানসের পরিচয় পাওয়া যায় –

> ছেলেটার এ্যাকসিডেন্টের খবর তার অঞ্চলে পৌঁছামাত্র সেখানে সব লোক এসে উপস্থিত। হাজার হাজার মানুষ। হাউমাউ করে কাঁদছে। দেখবার মতো একটা দৃশ্য। বুঝলি বীণা, আমরা মানুষের বাইরেরটাই শুধু দেখি। অন্তর দেখি না।[২]

গল্পের অন্তিমে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার বোধটি হয়ে ওঠেছে প্রকট ।

[১] গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪০

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৪৯

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের গল্প 'নিশিকাব্য'। এ গল্পে অভাব সীমাহীন কিন্তু প্রেম অন্তহীন। অবিরাম প্রেমের ঝরনাধারায় সিক্ত সংসারের সবাই। সংসারের বড় ছেলে আনিস, অল্প বেতনের চাকুরে; একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাড়িতে আসার সুযোগও তার প্রায় হয়ে ওঠে না। সন্ধ্যা রাতে বাড়ি এসে আবার শেষ রাতেই ফিরে যেতে হয় কর্মক্ষেত্রে। বাড়িতে আনিস আসলে সকলের মধ্যেই তৈরি হয় উৎসবের আমেজ। আনিসের স্ত্রী পরীর খুশি হয়ে ওঠে বাঁধভাঙা। চমৎকার দাম্পত্য-প্রেমের স্বরূপটি এ গল্পে নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। আনিসের বাড়িতে আসা এবং ক্ষণকালের জন্য পরীর বিয়ের শাড়ি গায়ে জড়ানো তাদের অনুপম দাম্পত্যের সম্পর্ককেই ইঙ্গিত করে –

> – ঘুমন্ত ঝুনুকে আবার ঘুম থেকে টেনে তোলা হলো। সে হঠাৎ বলে ফেলল –
> 'ভাবি আজ বিয়ের শাড়ি পরেছে কেন?'
> – পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোস্না লুকিয়ে ফেলল।[১]

এ গল্পে চলমান জীবনের একটি স্বচ্ছন্দ গতি আছে। জীবনের গতিশীলতাই পাঠককে করেছে মোহিত।

সমাজ নিন্দিত নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প 'মিস মনোয়ারা'। অত্যন্ত সংযমী ভাষায় লেখক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। ঘন্টায় পাঁচশ টাকা ফিতে গা ম্যাসাজ করে দেয় এম এম – মিস মনোয়ারা। শারমিন নামের এক গৃহবধূ সপ্তাহে একদিন এম এম – এর কাছ থেকে গা ম্যাসাজ করে নেয়। কিছুদিন পর সপ্তাহে দুদিন করে ম্যাসাজ

করার বন্দোবস্ত হলো। এক শুক্রবারে সংবাদ পত্রে ছাপা হলো আব্দুল মজিদ নামের এক লোক এম এম বা মিস মনোয়ারা নাম নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদের শরীর ম্যাসাজ করে দেয়। শুনে শারমিন হতভম্ব। তার শরীর কাঁপছে। বাথটাবে শুয়ে অনেকক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল সে। তার স্বামী তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো। পরের সোমবারে, যেদিন মিস মনোয়ারার আসার কথা, সেদিন সকাল থেকেই শারমিনের অস্থির লাগছিল। সে একসময় টেলিফোন করে তাকে আসতে বলল – 'শারমিন অপেক্ষা করছে। তার শরীরের দু' শ আঠারোটা নার্ভ এন্ডিং ছটফট করছে। শরীর জ্বলে যাচ্ছে।[২]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে সেক্সুয়াল সিকোয়েন্স নেই। তাঁর কোন গল্পেই এ বিষয়টি ওঠে আসেনি। অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী বলেই 'মিস মনোয়ারা' গল্পটিও মনোবিকলনের ভারে আক্রান্ত হয়নি। এই পরিমিতিবোধ হুমায়ূন আহমেদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১.. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৮৩৭

অসমাপ্ত দাম্পত্য প্রেমের গল্প 'কল্যাণীয়াসু'। করুণা এবং সন্দেহ মিশ্রিত প্রেমের অনবদ্য কাহিনি এটি। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। এ গল্পের কথক একজন আর্টিস্ট। গল্পটির গঠনশৈলী ভিন্নধর্মী। পত্রাকারে লেখা গল্পটি মুলত একাকী জীবনের বিক্ষিপ্ত মনের ভাবনা। এ চিঠি যার কাছে লেখা, সে আছে অন্য ভুবনে। তবু না বলা কথাগুলোর মহড়া চিঠির ছলে দেয়া। কথকের সংকীর্ণ মানসিকতা এবং দাম্পত্য সম্পর্কের দুর্বল দিকগুলো বিশ্লেষণী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে এ-গল্পে। কথকের বিয়ে হয়েছিল জরী নামের এক মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি অত্যন্ত রূপবতী। যার হাসি দেখেই প্রথম ট্রেন যাত্রায় গল্পকথকের মনে হয়েছিল –

> আমার মনে হলো সুখ কোনো অলীক বস্তু নয়। এর জন্যে জীবনব্যাপী কোনো সাধনারও প্রয়োজন নেই। প্রভাতের সূর্য কিরণ বা রাতের জ্যোৎস্নার সতোই এও আপনাতেই আসে।[১]

বিত্তশালী পরিবারে বিয়ে হয়েও জরী কিন্তু সেই সুখের সাক্ষাৎ পায়নি বা পেতে চায়নি। তার মনে বাস করতো অন্যজন। সে জরীর আনিস স্যার। কলেজের অঙ্কের শিক্ষক। কিন্তু আলাভোলা এ মানুষটির চেতনার জগৎ ভিন্ন। খামখেয়ালির জন্য যার চাকরি চলে গিয়েছে সে যে কারো দায়িত্ব নিতে পারবে না– এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান জরীর ছিল না। আনিস সাহেবকে চাকরি দেয়ার অনুরোধ করে জরী তাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে আসে।

আনিস সাহেবের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ জরী ও গল্পকথকের দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরায়। গল্পকথক তার মানসিকতার সহজ স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এভাবে –

> তোমার স্যার ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এমন সহজ, এমন নির্লোভ লোক আমি খুব কমই দেখেছি। কোনো কিছুর জন্যেই কোনো মোহ নেই। এমন নির্লিপ্ততা কল্পনাও করা যায় না। জরী, তুমি ঠিক লোকের প্রেমেই পড়েছিলে। এমন মানুষকে ভালোবেসে দুঃখ পাওয়াতেও আনন্দ। তোমার স্যার ফেরেশতা ছিলেন কিন্তু জরী আমি তো ফেরেশতা নই। আমার হৃদয়ে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি ও ঘৃণা আছে। আমি সত্যি একজন সাধারণ মানুষ।[২]

এরপর ক্রমেই দুজনের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। গল্পকথকের অসুস্থ হয়ে যাওয়া, আনিস স্যারের চলে যাওয়া এবং জরীর আত্মহত্যা – ঘটনাগুলো দ্রুতই ঘটে যায়। ঘৃণার দেয়ালে বন্দি হয়ে জরী ক্রমাগত নিজেকে গুটিয়ে নেয়। চরম অসুস্থতার মধ্যেও ভালোবাসার হাতটি নিয়ে জরী স্বামীর পাশে দাঁড়ায়নি। ঘৃণার খোলসে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে সে নিঃশেষ করে দিয়েছে বিষপানে। তবু জরীর প্রেমের জন্য আমাদের মনে কোনো সহানুভূতি জাগ্রত হয় না। গল্পকথক জরীকে প্রচণ্ড ভালোবেসেছে এবং তার চাইতেও বেশি ভালোবাসা এখনো সে জরীর জন্য অনুভব করে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৮৭

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৯১

জরীর জন্য নয়, আমাদের মন বিগলিত হয় গল্পকথকের অবিনাশী প্রেমের জন্যে। যে দাম্পত্য প্রেমের স্পর্শ সে লাভ করেনি, কল্পলোকে তা সে পেতে চাচ্ছে। তাই সে ভাবে প্রথম দিনের ট্রেনযাত্রার কথা যখন সামনাসামনি ছিল শুধুই দুজন। এ চিঠিটা কথক জরীকে পাঠাতে চায় না। কেননা যৌবনের উত্তাপ জরীকে স্পর্শ করেনি, এখন তা করবে না বলাই বাহুল্য।

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের নর-নারীর সম্পর্কের স্বরূপ সম্পর্কে বলা যায় – প্রণয়ঘটিত গল্পগুলোয় তিনি যৌন সম্পর্কের তরল, পিচ্ছিল ও আরোপিত কোন ঘটনা আনেননি। গল্পগুলোয় নারীদের তুলনায় পুরুষদের বেশি ক্রিয়াশীল মনে হয়। প্রণয়ঘটিত গল্পগুলোর ভৌগোলিক পরিসীমা ঢাকা শহর এবং নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষেরা এসবের কুশীলব। গল্পের নায়িকারা শুভ্র ও পবিত্র। এক ধরনের শুচিতা তাদের আছে। সবাই সুন্দর এবং পরিণতির ব্যাপারে প্রায় উদাসীন। দাম্পত্যসম্পর্কের গল্পগুলোয় প্রেম আছে অফুরন্ত তবে নিয়তিচালিত বেদনাবোধও আছে। বিবাহপূর্ব প্রণয় সম্পর্কের গল্পগুলোয় গভীর প্রেম থাকলেও প্রায় সবই পরিণতিহীন। গল্পের নায়ক শিক্ষিত বেকার তবে খুবই রোম্যান্টিক। প্রেমের ব্যর্থতার দায় কাউকে দেওয়া হয়নি। নিয়তিকে মেনে নিয়েছে সবাই। হুমায়ূন চিত্রিত প্রেমের আছে শুভ্রতা এবং প্রেমগুলো নিষ্কলঙ্ক। গল্পগুলোতে পরিপূরক প্রেমের কোন চিত্র নেই। জীবন চলার পথে কেউ কাউকে সম্মুখপানে চালাতে প্রাণশক্তি হয়ে আসেনি আবার চলার পথে বাধাও কেউ হয়নি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হুমায়ূন আহমেদের অতিপ্রাকৃত ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক ছোটগল্প

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হুমায়ূন আহমেদের অতিপ্রাকৃত, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক ছোটগল্প

অতিপ্রাকৃত গল্প

বাংলা সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত গল্প রচনার রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'মণিহারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ' – প্রভৃতি গল্প যেমন পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে, ঠিক তেমনি শিল্পের বিচারেও এগুলো হয়ে উঠেছে অনতিক্রমী। হুমায়ূন আহমেদও বিচিত্রাস্বাদী অতিপ্রাকৃত গল্প রচনা করেছেন এবং সম্পাদন করেছেন নিজস্বতা।

তাঁর একটি অতিপ্রাকৃত গল্প 'পিঁপড়া'। নেত্রকোণা অঞ্চলের ধনাঢ্য ব্যক্তি মকবুল হোসেন ভূঁইয়া। সে শহরে নুরুল আফসার নামে এক বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে এসেছে। তার রোগটি হলো– প্রতিনিয়ত তাকে পিঁপড়া কামড়ায়। হাজার হাজার লাল পিঁপড়া মুহূর্তেই তাকে ঘিরে ফেলে। নুরুল আফসার সাহেব প্রথমে রোগীকে ধমক দিয়ে বের করে দিতে চাইলেও পরে নিজেই দেখলেন আশ্চর্য সেই ঘটনা –

> তার কাছে মনে হলো মকবুল কিছুক্ষণের জন্যে হলেও উন্মাদ হয়ে গেছে। চিন্তা ও বিচার শক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। তিনি দেখলেন মকবুল হিংস্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে পা ঘসে ঘসে পিঁপড়া মারার চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, দুহাতে পিষে ফেলল পিঁপড়ার সারি। মকবুলের মুখ ঘামে চট চট করছে। চোখের তারা ঈষৎ লালাভ। মুখে হিস হিস শব্দ করছে এবং নিচু গলায় বলছে, "হারামজাদা, হারামজাদা"।[১]

পির-ফকির, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক জাতীয় আধিভৌতিক সব চিকিৎসা করিয়েও মকবুল পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। এমন কোন চিকিৎসা বাকি নেই যা সে করায়নি। যে যা বলেছে তাই করেছে। কত কিছু গায়ে মেখেছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

কোনদিন থেকে পিঁপড়া তার পিছু নিয়েছে – এমন প্রশ্নের জবাবে জানা গেলো মকবুল নামের লোকটির বীভৎস অতীতের কথা। মকবুলরা ছিল তাদের অঞ্চলের সবচেয়ে বিত্তশালী। তার দাদার আমল থেকে ওঠে আসা বিশাল প্রতিপত্তির অংশীদার মকবুল নিজেকে পরিচালিত করেছে বিপথে। তাকে কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না বলে দিন দিন তার চরিত্র বিনষ্টির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়। তাদের বাড়ির দাস-দাসি, গরিব আত্মীয় স্বজনের স্ত্রী-কন্যারা কেউ মকবুলের হাত থেকে রেহাই পায়নি; কোন বিচারও কেউ পায়নি। দুটি বিয়ে করেও মকবুল তার স্বভাব পাল্টাতে পারেনি। দূর সম্পর্কের এক বোনের মেয়ের দিকে এবার সে বাড়িয়ে দেয় লোভী দৃষ্টি।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩০।

শ্যামলা রঙের তের-চৌদ্দ বছর বয়সের মেয়েটাকে তার মা সব সময় মকবুলের কাছ থেকে আগলে রেখেছে। মেয়েকে নিয়ে মকবুলের মায়ের ঘরে মা-মেয়ে মেঝেতে ঘুমালেও শেষ রক্ষা হয়নি। একদিন রাতে মকবুল মেয়েটিকে ধর্ষণ করে।

মেয়েটির মা ক্ষোভে-অপমানে মেয়েকে ইঁদুর মারার বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। নিজেও হয় আত্মঘাতী। এরপর মকবুল নিজেই পুলিশ আনতে থানায় যায়। পুলিশকে নজরানা দিয়ে প্রায় তিন দিন পর সে পুলিশ সহ গ্রামে ফিরে আসে। এদিকে তিন দিনে লাশ দুটি পচে গলে ভয়ঙ্কর অবস্থা। মকবুলের বর্ণনায় তা উঠে আসে এভাবে –

> বর্ষাকাল। গরমের দিন। তিন দিনেই লাশ পচে গেছে। বিকট গন্ধ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঁঠাল গাছের কাছে নিয়া দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লাখ লাখ লাল পিঁপড়া লাশের শরীরে। মনে হইতেছে সারা শরীরে লাল চাদর। মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ হাত পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিঁপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিঁপড়া যখন এক সাথে নড়ে তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।[১]

এরপর মকবুল একটি সিগারেট ধরাল। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিঁপড়া নড়ে উঠল। এবং এক সময় সবগুলি পিঁপড়া এক সাথে মকবুলকে ঘিরে ফেলল। মকবুল দৌঁড়ে যেখানে যায় সেখানেই পিঁপড়া। সেই থেকে শুরু। আজও পিঁপড়া মকবুলের পিছু ছাড়েনি। ডাক্তার সাহেব লক্ষ করলেন –

> পিঁপড়ার দল মকবুলের বাঁ হাতে উঠতে শুরু করেছে। দুটি সারি ছাড়াও নতুন একটি সারি পিঁপড়া রওনা হয়েছে।[২]

পিঁপড়া এখন মকবুলের ফুসফুসেও আশ্রয় নিয়েছে। কাশির সাথে পিঁপড়া ও ডিম এক সাথে বেরিয়ে আসে। তার মরণ পিঁপড়ার হাতে এ কথা মকবুল বুঝে গেছে।

কিন্তু কে এদের পরিচলিত করছে? কে সেই সূত্রধর? মানবজীবনের অন্তহীন রহস্যের মতো মকবুলের কাছেও সমস্যাটি দুর্জ্ঞেয় মনে হয়। প্রকৃতির অতি তুচ্ছ পিঁপড়া কী করে মানবজীবনকে বিষিয়ে তুলছে, কোন মহা শক্তিধর এটি করাচ্ছেন তা মানুষের অজানা। মানুষের পৃথিবীতে অন্যায় করে মানুষ পার পেয়ে যেতে পারে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি মানুষকে অসহায় করে তুলতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির হাত থেকে মানুষের পালিয়ে বাঁচবার উপায় নেই। মানব জীবনের এক জটিল জিজ্ঞাসা হুমায়ূন আহমেদ এ গল্পে তুলে ধরেছেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৪

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৫

আলীমুজ্জামান নামের এক ব্যক্তির জীবনে ঘটে যাওয়া অতি প্রাকৃত বিষয়ের গল্প "কুকুর"। আলীমুজ্জামান সাহেব তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। শীতকালের এক সন্ধ্যায় তিনি দেখলেন এলাকার কিছু ছেলে শুকনো কাঠ, কাগজ এই সব দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে। ছেলেদের মধ্যে নান্টু নামের এক ত্যাঁদড় ছিল। সে একটি কুকুরছানার গায়ে কম্বল জড়িয়ে তাতে কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আলীমুজ্জামান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুকুর ছানাটি উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। আগুনে তার শরীরের অনেকটা অংশ ঝলসে গেছে। তিনি চিকিৎসা নিয়ে বেঁচে গেলেও কুকুর ছানাটি বাঁচেনি।

এরপর প্রায়ই তিনি দেখেন কুকুরের একটি বিশাল দল তার বাড়ির সামনে জটলা করতে থাকে। সাতষট্টি বছর বয়স্ক আলীমুজ্জামান অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস না করলেও এই ঘটনাটি তাকে দিনের পর দিন দেখে যেতে হয়েছে। তিনি যখন রাস্তায় হাঁটেন দুই তিনটা কুকুর সব সময় তার সাথে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো কুকুরের দলে সেই কুকুর ছানাটিও থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর।

'দ্বিতীয় জন' ভয়ঙ্কর অতিপ্রাকৃত গল্প। প্রিয়াংকার স্বামীর নাম জাভেদ। কলেজের লেকচারার জাভেদ স্বামী হিসেবে অন্ত্যন্ত দায়িত্বশীল। প্রিয়াংকা তাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি। দারিদ্র ঘরের মেয়ে প্রিয়াংকা। মামা-মামির সংসারে মানুষ। বয়স মাত্র সতেরো বছর। জাভেদের বয়স ত্রিশ। তবু প্রিয়াংকার মনে কোনো আফসোস নেই। বিপত্নীক স্বামী পেয়ে সে অখুশি নয়। জাভেদ-প্রিয়াংকা ভাড়া থাকে ছোট একটি ফ্ল্যাট বাসায়। বিয়ের কয়েকদিনের মাথায় তার ভয়ঙ্কর অসুখটি ধরা পড়ে। এ অসুখের নাম ভয়। জাভেদ পাশে শুয়ে আছে অথচ বারান্দায় তাকে দেখা যায়, পড়ার ঘরে দেখা যায়, চোখে চোখ পড়লে তার কাছে পানি চায়। প্রিয়াংকা ভাবতে চেষ্টা করে এগুলো আসলে মনের ভুল। কারণ রাতে এ ভয়টা করলেও দিনে কোন সমস্যা হয় না। তবে দিন দিন ভয়টা বাড়তে লাগলো। কারণ তার স্বামীকে এখন খুব কাছ থেকে দেখে মনে হয় দুজন মানুষ। একজন নকল, একজন আসল। কে আসল কে নকল এই ভয়েই প্রিয়াংকা ভীত সন্ত্রস্ত নির্ঘুম রাত কাটায়। ভয়ের মাত্রা আরো বেড়ে যায় যখন প্রিয়াংকা জাভেদের প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার কারণ শোনে কাজের মেয়েটির কাছে –

> –হঠাৎ মাথাটা খারাপ হইয়া গেল। উল্টা পাল্টা কথা কওয়া শুরু করল কী জানি দেখে।
>
> –কী দেখে?
>
> –দুইটা মানুষ নাকি দেখে। একটা আসল একটা নকল। কোনটা নকল কোনটা আসল বুঝতে পারে না।[১]

প্রিয়াংকাও বুঝে ফেলল তার পরিণতি কী হতে যাচ্ছে।

১. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

মেক্সিকান পাইথন নামের এক অজগর সাপ নিয়ে গল্প 'বেবি রূথ'। লেখক আমেরিকায় যে রুমিং হাউসে ভাড়া থাকেন তার পাশের ঘরে এলিজাবেথ এন্ডারসন নামের এক আমেরিকান বুড়ি বাস করে। 'আমেরিকানদের কোন কাণ্ডকারখানায় অবাক হব না' বলে সিদ্ধান্ত নিলেও লেখক বরাবরই নানা কারণে অবাক হতে থাকেন। শুধু অবাক নয় হতভম্বও হচ্ছেন। কারণ, বুড়ি মেক্সিকান পাইথন নামের একটি বিশালাকার অজগর সাপ কিনে এনেছেন পুষবেন বলে। লেখকসহ অন্যান্য হাউসমেটেরা বুড়ির এই উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। আতঙ্কে দিন কাটতে থাকে তাদের। যেমন–

> আমাদের দিন এবং রাত কাটতে লাগলো দুঃস্বপ্নের মধ্যে। সাপটাকে অদ্ভুত সব জায়গায় পাওয়া যেতে লাগল। হান একদিন ওভার কোর্ট গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচঁড়াচ্ছে। হঠ্যাৎ তার মনে হলো গা বেয়ে হড়হড় করে কি যেন নেমে যাচ্ছে।[১]

এরপর অনন্ত নাগ, তোহার জীবনের মেক্সিকান পাইথন ভয়ঙ্কর রূপে আবিভূর্ত হলো। কেবল এলিজাবেথ বিকারহীন। সে সাপের ইন্স্যুরেন্স করলো। আরো নানারকম আহ্লাদের সীমা নেই। এলিজাবেথ তার পোষা সাপের নাম রাখাল রুথ, কয়েক দিনের মধ্যেই রুথ সকলের প্রিয় হয়ে উঠল।

রুথ বাড়িতে আসা অতিথিদের সাথে ভয় দেখানো মজা করতো কুন্ডুলী পাকিয়ে বসে টিভি দেখতো আরো কত কী? রুথ বেশ কয়দিনের মধ্যেই রুমিং হাউসের এক সদস্যতে পরিণত হলো। তাকে নিয়ে আনন্দ এবং আগ্রহের কমতি ছিল না কারো। স্প্রিং কোয়ার্টার শেষ হবার আগেই রুথ উধাও হলো। অনেক খুঁজেও তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। অনেকের মন বিষণ্ন হয়ে উঠল। তোহা গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে মোমবাতি জ্বালিয়ে এলো – রুথ যেন ফিরে আসে। এরপর বুড়ি ছাড়া অন্য তিনজন চলে গিয়েছে দূরে, সময়ের প্রয়োজনে, জীবনের তাগিদে। তারপর অনেকদিন পর একদিন বিরাট হৈ চৈ শুনে লেখক বাইরে এসে দেখেন –

> রুথ ফিরে এসেছে তবে একা ফেরেনি। তার সাথে কিলবিল করছে গোটা বিশেক সাপের ছানা। সব কটি প্রায় এক ফুটের মতো লম্বা। বোঝাই যাচ্ছে রুথ কোথাও গিয়ে ডিম দিয়েছে। বাচ্চা ফুটিয়ে তাদের খানিকটা বড় করে নিয়ে এসেছে আমাদের দেখাতে।[২]

কিন্তু মানুষ কি সকলের ভালোবাসা গ্রহণ করবে? মানুষ শুধু স্বজাতির ভালবাসা গ্রহণ করে, অন্য কারো না। ফলে দমকল বাহিনি ডাকা হলো। সাপগুলো ধরে পলিথিন ব্যাগে ভরে নিয়ে যাওয়া হলো। লেখক এবং বুড়ি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

দশ-এগারো বছর বয়সের মন্তাজ মিয়ার জীবনে ঘটে যাওয়া অতিপ্রাকৃত ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প 'ছায়াসঙ্গী'। হতদরিদ্র মন্তাজ মিয়া বছর তিনেক আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৬৬

[২]প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৬৮

সেই জ্বরের প্রকোপ এতোই বেশি যে, তার বাবা একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মারা গেল। দিনের আলো থাকতেই তার দাফন সম্পন্ন করা হলো। সংবাদ পেয়ে মন্তাজের বড় বোন ছয় মাইল দূর থেকে বাবার বাড়ি এলো। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এসেছে এবং বাড়ীতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলছে – 'তোমরা করছ কী? মন্তাজ বাইচ্যা আছে। কবর খুঁইরা তারে বাইর কর। দিরং করবা না'।

গ্রামের লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজন প্রথমে মনে করলো রহিমা অতি শোকে প্রলাপ বকছে। কিন্তু ধীরে ধীরে রহিমা কথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। গ্রামের মাওলানা সাহেবকে আনা হলো। রহিমা তার পা জড়িয়ে বসে রইলো। অবশেষে কবর খোঁড়া হলো এবং দেখা গেলো –

> ভয়াবহ দৃশ্য !
>
> মন্তাজ মিয়া কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ প্রবল আলো চোখে পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়টি এক খন্ড লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খন্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।[১]

প্রথম প্রথম গ্রামের মানুষ মন্তাজকে ভয় পেলেও ধীরে ধীরে 'আল্লাহর কুদরত' বলে মেনে নিয়েছে। কবরে জ্ঞান ফেরার পর মন্তাজ কেমন বোধ করল, ভয় পেল কি না, কী দেখল, এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর মন্তাজ দেয়নি। লেখকের চাপাচাপিতে কেবল দুটি কথা সে বললো-

> –কবর তো খুব অন্ধকার তবুও ভয় লাগল না?
>
> –আরেকজন আমার সাথে আছিল তাই ভয় লাগে নাই।[২]

সেই আরেকজন কে মন্তাজ জানে না। কারণ অন্ধকারে তাঁকে সে চিনতে পারেনি। তার গায়ে শ্যাওলার গন্ধ ছিল এবং সে তাকে অভয় দিয়ে বলেছে– ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সে নাকি অনেক মজার মজার কথা বলতো। হাসির কথা। কী কথা – মন্তাজ মিয়ার 'ইয়াদ নাই'। তবে আরেকটি কথা তার মনে পড়েছে। গোপন কথা কিন্তু বলা যাবে না। মন্তাজ আবার দৌড়ে পালাল। কিছু রহস্য তার কাছেই রাখতে চায় মন্তাজ। শেওলাগন্ধী সেই ছায়াসঙ্গী মন্তাজের একটি গোপন কথা হয়েই থাকলো। থাকুক। কিছু গোপন কথা রাখার অধিকার তার আছে। কার্যকারণহীন এবং ব্যাখ্যাতীত অনেক রহস্যসময় ঘটনাই এ জগতে ঘটে। সেই রহস্যকে ভেদ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

মোতালেব নামের অস্বাভাবিক চরিত্রের একজন মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প 'শবযাত্রা- ১'। মোতালেব সাহেব ঘোর নাস্তিক এবং যুক্তিবাদী একজন মানুষ। এম.এ. পাশ করার করার পর এই ভদ্রলোক বাড়ি থেকে দূরে একটি শহরতলীতে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৪৭।

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৫১।

বাড়িটি ছিল কোনো এক জজ সাহেবের শখ করে বানানো। দু তলা একটি বাড়ি। বাড়ির কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। ইয়াকুবের স্ত্রী ছিল অত্যন্ত রূপবতী। স্ত্রী সম্পর্কে ইয়াকুবের বক্তব্য –

> জীবনে বড় ভুল কী করেছিলাম জানেন স্যার? সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম। ডানাকাটা পরী বিয়ে করেছিলাম। আগুনের মতো ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তা-ই হলো আমার জীবন হলো অতিষ্ঠ।[১]

ইয়াকুবের স্ত্রীর চরিত্রে দোষ ছিল। অনেকের সাথেই সে অবৈধ মেলামেশা করেছে। তিনবার বিচারসভা বসেছে। বৈঠকে বউকে তালাক দিতে বলা হলো। দুটো যমজ বাচ্চা আছে– এই ভেবে ইয়াকুব তালাক দেয়নি কিন্তু ইয়াকুবের স্ত্রী স্বামী-সন্তানদের ফেলে চলে গেলো। এরপর থেকে তাকে দেখা গেল মোড়লগঞ্জের বাজারে খারাপ মেয়ে মানুষদের আখড়ায়। তারপর চলে গেছে কতদিন। মেয়ে দুইটি এখন বুঝতে শিখেছে।

ইয়াকুবের মেয়ে দুটির সাথে মোতালেব সাহেবের প্রচণ্ড ভাব হলো। বাচ্চারাও তাকে পছন্দ করলো। একদিন ছোট মেয়েটার গলায় মুখে কী একটা সমস্যা হলো– সারা মুখ ফুলে গেলো। মোতালেব সাহেব কিছু টাকা দিয়ে দ্রুত মহিষের গাড়ি করে ইয়াকুবকে হাসপাতালে পাঠালেন। মেয়েটি হয়তো বাঁচবে না– এই ভেবে তাঁর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল।

সন্ধ্যায় শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি, ব্রজপাত। মোতালেব সাহেব লিখছেন। এমন সময় কে একজন তাকে মেয়েলি গলায় ডাকল। সাহসী মানুষ মোতালেব সাহেব হতভম্ব হয় লক্ষ করলেন সবুজ ডুরে শাড়ি পরে অতি রূপবতী মেয়েটি তাঁকে বারান্দায় ডাকছে। তিনি ওঠে গেলেন কিন্তু বারান্দায় কাউকে পেলেন না। বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। ধুপ ধুপ শব্দ আসছে সামনের বাঁশবন থেকে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন বাঁশবাগানে ব্যস্ত হয়ে মাটি কাটছে ইয়াকুব। সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ তার পাশে। বাচ্চা দুটি এক দৃষ্টিতে মৃত দেহটির দিকে তাকিয়ে আছে। মোতালেব সাহেব যুক্তিবাদী মানুষ। অতিপ্রাকৃতে তিনি বিশ্বাস করেন না। সেদিনের ঘটনার বেশ কিছু ব্যাখা তিনি দাঁড় করিয়েছেন। পুলিশ এনে ঐ জায়গায় মাটি খুঁড়িয়েছেন। পাননি কিছু; তবে তিনি ঐ বাড়িটি কিনে নিয়েছিলেন। আর ইয়াকুবকেও সাথেই রেখেছেন। ইয়াকুব তার স্ত্রীকে হত্যা করেছিল কিনা ঐ প্রশ্নের জবাবে সে কিছু বলেনি।

মোতালেব সাহেব বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটা দিন ঐ বাড়িতে অবস্থান করেন। তাঁর বিশ্বাসী মন হয়তো বলে ঐ দিন ঘটনার অংশবিশেষ তিনি দেখেছিলেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৬৭।

একদিন পুরো ঘটনাটি প্রকৃতি তাকে দেখাবে হয়তো। চরম নাস্তিকের মধ্যেও যে প্রচণ্ড আস্তিকতা থাকতে পারে – এ গল্পটি সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। নেত্রকোণা অঞ্চলের কলঘাটি গ্রামের জীবন্মৃত মানুষ রহমান মিয়ার গল্প – 'শবযাত্রা-২'। রহমান মিয়া মারা যায় বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহরে। রহমানকে দাফন-কাফনের শেষ পর্যায়ে কবরে নামানো হবে এমন সময় সে উঠে পড়ে এবং সকলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে– পানি দেন পানি খাব। এ ঘটনার দুই মাস উনিশ দিনের মাথায় লেখকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। রহমান মিয়া নিজেকে মৃত হিসেবেই প্রচার করে। গ্রামের মানুষও সে কথায় ব্যাপক আস্থা পোষণ করে ।

শহর থেকে এম বি বি এস পাস করা ডাক্তার এনে পরীক্ষা পর্যন্ত করানো হয়েছে। পালস একটু ডাউন তবে প্রেসার নরমাল। তবুও গ্রামের সব মানুষকে বিশ্বাস করানো যায়নি যে রহমান মিয়া মৃত নয়। রহমান মিয়াও নিজেকে মৃতই ভাবে। তার ছেলে মেয়ের নাম, বাবার নাম কিংবা অতীতের কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে সে শুধু বলে – ইয়াদ নাই। লেখক এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দাঁড় করালেন। আলজেমিয়ার'স ডিজিজ হলে এমনটি হয়। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানোরও এ রোগ ছিল। রহমান মিয়া চোখের পাতা ফেলে না। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। এরও ব্যাখা জানিয়ে দিয়েছেন লেখক। কোনো কারণে শরীরের একটি প্রত্যঙ্গ কর্মহীন হয়ে পড়তে পারে। কুষ্ঠ রোগ হলেও ত্বকের অনুভূতি নষ্ট হয়।

- হাতে কুপির আগুন ধরা হয়েছিল। চামড়া পুরে গেছে কিন্তু রহমান মিয়া ব্যথা পায়নি।
- এর ব্যাখাটিও আগের মতোই।
- রহমান মিয়াকে কখনো মশা কামড়ায় না।

মেয়ে মশা রক্ত খায় তার পেটের ডিমের পুষ্টির জন্য। হয়তো রহমান মিয়ার রক্তে সমস্যা আছে। তাই মশায় কামড়ায় না। তবে আরেকটি লক্ষণের কোনো ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারলেন না। সেটি হলো– রহমান মিয়া যেখানে যায় সেখানেই শকুন চলে আসে। শুধু শকুন নয় শেয়াল কুকুরও আসে। তার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কেউ জায়গা দেয় না। যে শকুন দেশ থেকে উধাও হয়েছিল তারা আবার কীভাবে ফিরে এসেছে এ ব্যাখ্যা কারো কাছে নেই। লেখক যখন ট্রেনে উঠে পড়েছেন তখন ট্রেনের জানালা ধরে রহমান মিয়া এগিয়ে চলছে আর বিড়বিড় করে বলছে যে, সে একটা কথা বলতে চায়। 'কথাটা কেউ বুঝব না, আপনে বুঝবেন' – শুনে লেখক আগ্রহ নিয়ে শুনতে চাইলেন। পরক্ষণেই রহমান মিয়া জানাল 'তার ইয়াদ হইতেছে না'। লেখক আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন দুটি শুকুন অবিকল মানুষের মতোই হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে রহমান মিয়ার দিকে।

নিঃসঙ্গ জীবনের অতিপ্রাকৃত গল্প 'নেড়িকুকুর এবং আজহার উদ্দিন মণ্ডল'। আজহার উদ্দিন ফরমায়েশি একজন লেখক। বিসিএস গাইড, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য, সোলেমানি জাদু, পবিত্র হজ পালনের নিয়মাবলি, বড়দের হাস্য কৌতুক, খোয়াব নামা, অলিম্পিক খেলার ইতিহাস, ভালো

ছাত্র হওয়ার কৌশলসহ বেশকিছু বই তিনি লিখেছেন। তিনি একজন নামকরা প্রুফরিডার। বাংলা বানানে তার দক্ষতা এবং কিছুটা রোগা বলেই তাকেই আড়ালে সবাই ডাকে চিকনা-ডিকশনারি।

অত্যন্ত ভালো মনের এবং নির্ভেজাল মানুষ আজহার উদ্দিন। বই লেখেন, প্রেসে প্রুফ দেখেন এবং একা বাস করেন। তার স্ত্রী একমাত্র পুত্রটিকে নিয়ে চলে গেছে অন্য এক লোকের সাথে। চব্বিশ বছর ধরে আজহার উদ্দিন একাকী জীবন যাপন করছেন।

নিঃসঙ্গতাবোধ মানুষকে করে তোলে সঙ্ঘবিমুখ এবং সমাজবিমুখ; কখনো আবার আত্মবিনাশী কিংবা সমাজবিনাশী। আজহার উদ্দিন হয়েছেন সঙ্ঘবিমুখ। এই মানুষটি মানুষের সঙ্গ পছন্দ করেন না। কোনো গল্প-আড্ডায় তিনি যোগ দিতে পারেন না। ফলে তার বাসায় থাকা নেড়িকুকুরটি হয়ে ওঠে তার সুখ-দুঃখের সাথী। কুকুরের কথা তিনি বুঝতে পারেন। কুকুর অবিকল মানুষের মতো বলে যায়। 'যে জীবন দোয়েলের ফড়িঙের মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা' – তাই রাস্তার নেড়িকুকুর হয়ে ওঠে জীবনানন্দের উৎস –

> আজহার উদ্দিন মণ্ডল ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসলেন। কুকুরটা মুখোমুখি না বসে তাঁর পাশে বসেছে। তাতে গল্প বলতে আজহার উদ্দিন মণ্ডলের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কুকুরতো আর মানুষ না যে তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলতে হবে। সে পাশে বসে কথা শুনছে এ-ই যথেষ্ট। এই আনন্দ তার রাখার জায়গা নেই।[১]

'ভয়' গল্পে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা চিত্রিত হয়েছে। তবে হুমায়ূন আহমেদ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেননি, তিনি গল্পই বলে গেছেন। পরীক্ষার কাজে কোন এক গণ্ডগ্রামের একটি কলেজে গিয়েছিলেন তিনি। কলেজের অভ্যন্তরেই থাকার ব্যবস্থা। কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রদর্শক সিরাজ উদ্দিন সাহেব গল্পবাজ মানুষ। তার গল্পের সবটা জুড়েই থাকে সাপ-খোপ। সাপের গল্প ছাড়া তিনি কোনো গল্প জানেন বলেও মনে হয় না। লেখক অনেকক্ষণ লোকটির সঙ্গে গল্প করলেন, খাবার খেলেন। সিরাজউদ্দিন চলে যাওয়ার পরপরই তিনি প্রচণ্ড ভয় পেতে শুরু করলেন। প্রথমে তা কাকতালীয় মনে হলেও পরের দিনও একই ঘটনা। এবার লেখক গভীর রাতে দারোয়ান কালিপদকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজউদ্দিনের বাড়ির দিকে ছুটলেন। তার মনের ভ্রম দূর করতে হবে। দুই মাইল রাস্তা হেঁটে তিনি সিরাজউদ্দিনের বাড়িতে গেলেন। তাকে দেখে সিরাজউদ্দিন হতভম্ব।

কিছু সময় কাটিয়ে লেখক কলেজের দিকে রওয়ানা হলেন। সিরাজ সাহেব কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে গেলেন। সিরাজ সাহেব চোখের আড়াল হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। মাথা ধরে বসে পড়লেন।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৬২২।

পরদিন চায়ের দাওয়াত খেতে কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় গেলেন লেখক। তিনি জানলেন প্রিন্সিপালের ছেলে কী করে অসুস্থ হয়ে তখন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটি কিছুটা ভালো থাকে শুধু সিরাজ সাহেবকে দেখলে। তার সাথে কথা বলে না কিন্তু দেখলে খুশি হয়, মুচকি হাসে। কয়েকদিন সিরাজ সাহেবকে না দেখলেই তার পাগলামি বেড়ে যায়। লেখক পরীক্ষার কাজ অসমাপ্ত রেখেই ঢাকায় চলে এলেন। তিনি মনে করতে চাইলেন সিরাজ নামের কারো সাথে তার দেখা হয়নি। সবই উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ফসল।

তারপর অনেকদিন পর ঢাকার বায়তুল মোকাররমের পাশের ফুটপাতে লেখকের সাথে সিরাজউদ্দিন সাহেবের দেখা হয়। জানা যায় আগের প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলেটি মারা গেছে । বিরুই নদীতে তিন দিন পরে তার লাশ সিরাজ সাহেবের বাড়ির ঘাটেই ভেসে ওঠে। তিনিই প্রথম দেখেন। নতুন প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথেও তার বেশ খাতির। নিয়মিত বাসায় যান। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো নতুন প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী ভয় পেয়ে কেমন চিৎকার চেঁচামেচি করে মাঝে মধ্যেই। হুবুহু আগের প্রিন্সিপালের ছেলের মতো। অথচ সিরাজ সাহেব শিশুর মতোই হাসেন। চোখ দুটি মমতায় আর্দ্র।

'ওইজা বোর্ড' গল্পে একটি খেলনা হয়ে ওঠে অবচেতন মনে প্রতিবিম্ব। নিম্নমধ্যবিত্ত একটি সংসারের হালচাল লেখক বর্ণনা করেছেন। এ পরিবারটির আয়ের একমাত্র উৎস পুত্র আলাউদ্দিন। সে থাকে আমেরিকায়। দেশে আসার সময় তার বিবাহিত বিদেশি স্ত্রী ক্লারাকেও সঙ্গে করে এনেছে আলাউদ্দিন। বাড়িতে না থেকে স্ত্রীকে নিয়ে সে হোটেলে রাত কাটিয়েছে। সামান্য বিষয় নিয়ে পরিবারের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে করেছে। মাসকাবারি খরচ যেখানে আরো কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন সেখানে সে আরো কমাতে চেয়েছে। পরিবারটি বুঝতে পেরেছে আলাউদ্দিনের সংসার-বিমুখতার কারণ তার বিদেশি বধূ ক্লারা। আলাউদ্দিনের ছোটবোন নাসরিন ভাইয়ের কাছ থেকে সামান্য একটি উপহার পেয়েছে । ওইজা বোর্ড– যার বোতাম টিপে আত্মাকে নামানো যায়। সে আত্মা অবিকল মানুষের মতো কথা বলে। যদিও তার বেশিরভাগ কথাই 'আমি জানি না' কিংবা 'হতে পারে' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু নাসরিনের সাথে সে কেবল 'আমি জানি না' কিংবা 'হতে পারে' বলা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নাসরিন গভীর রাতে ওইজা বোর্ড নিয়ে খেলতে বসে। কৃত্রিম আত্মা চলে আসে। সংসারের সংকটময় পরিস্থিতি, নিজের সুখ- দুঃখের কথা সে খেলনাটির কাছে ব্যক্ত করে। খেলনাটি তাকে পরামর্শ দেয় ক্লারাকে হত্যা করলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। ওইজা বোর্ড বারবার একই নির্দেশনা দেয়। নাসরিন হত্যাকে মহাপাপ বলেই জানে। না, সে তার ভাবিকে হত্যা করতে চায় না। কিন্তু তার অবচেতন মন কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আলাউদ্দিনের অবকাশ শেষ। ফিরে যাবে আমেরিকায়। তাই শেষ রাতটি সে বাড়িতেই কাটাতে চায়। সবাই যখন বসে গল্প করছে ক্লারা তখন শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ ক্লারার ঘরে দাউ দাউ করে

আগুন জ্বলে উঠল। সে চিৎকার করছে – Oh God ! Oh God ! নিতান্তই দুর্ঘটনা এটি। বাতাসে মোমবাতি কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল নেটের মশারিতে। সেখান থেকেই ক্লারার গাউনে আগুন লেগেছে। সিনথেটিক কাপড় বলে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না –

> ক্লারার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ একজন বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছিল। আগুন লেগে যাবার পর ক্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ঘর থেকে বেরুতে। বেরুতে পারেনি। চিৎকার করে দরজা খুলতে বলেছে – ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সঙ্গে তার চিৎকার কেউ শুনেনি।[১]

ক্লারার হত্যাকারী কে – এ বিষয়ে পাঠকের আর কোন সন্দেহ নেই। একটি খেলনা দিয়ে যে এত সুন্দর গল্প লেখা যায় তা হুমায়ূন আহমেদের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। জীবনের ক্রান্তিলগ্নে সাধারণ মানুষও হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর – এ কথাটিই গল্পের মূল উপজীব্য।

জয়নাল নামের অতি সাধারণ একজন মানুষের গল্প 'পানি রহস্য'। সে টলস্টয়ের বিখ্যাত গল্পের সাধু-সন্ন্যাসীও নয়, যারা হেঁটে সমুদ্র পার হতে পারতেন। মবিন সাহেব নামের এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয় জয়নালের। কামারের দোকানে কাজ করে সে। মাঝে মাঝে কুলির কাজও করে। মবিন সাহেব তার নাতনিদের সাথে নানা গল্পগুজব করেন।

একদিন তিনি টলস্টয়ের বিখ্যাত একটি গল্প বললেন। যে গল্পে একদল সাধু আছে যারা হেঁটে সমুদ্র পার হতে পারেন। এ গল্প শুনেই জয়নাল মবিন সাহেবের কাছে বার বার আসে। গল্পটি সে আবার শুনতে চায়। সাধু হওয়ার কৌশল জানতে চায়। গল্পের সাধুদের নাম জিজ্ঞেস করে। মবিন সাহেব মনে করেন জয়নাল বোকা মানুষ। বোকাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। তবে জয়নালকে তিনি স্নেহ করেন এবং বোকা বলে তাকে পছন্দও করেন। জয়নাল সম্পর্কে তিনি যে তথ্যগুলো জানলেন তা হলো–

– সে একটি পা ভাঙা কুকুরকে পাউরুটি, এটা-সেটা খাওয়ায় ।

– তার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই।

– সে কখনো পানিতে নামে না।

– সে কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে কাকদের পাউরুটি কিনে খাওয়ায়।

কুকুরটিকে পাউরুটি খাওয়ানোর কারণ – পা ভাঙার কারণে সে কোথাও যেতে পারে না। কাকদেরকে পছন্দ করে না বলেই সে তাদের আদর করে খাওয়ায়। প্রয়োজন পড়ে না বলেই সে কখনো মিথ্যা কথা বলে না। তার আপনজন কেউ নেই তাই কোন কিছুর প্রতি তার কোন মোহ নেই। সাধুদের সত্যবাদিতা এবং নির্লোভ বৈশিষ্ট্যের কথা জেনে মবিন সাহেবের কাছে তার চারিত্রিক গুণগুলো জানায় জয়নাল।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪০৩।

শ্বাসকষ্টজনিত কারণে জয়নাল ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়লো একদিন। মবিন সাহেব তাকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে জয়নাল পা ভাঙা কুকুরটির জন্য আফসোস করতে লাগলো। জয়নালের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকলো। মবিন সাহেব জয়নালের পাশে বসে রইলেন। এবার জয়নাল তাঁকে গোপন একটি কথা জানায়। সে সাধু-ফকির না, তবে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে। মবিন সাহেব ভাবলেন তার এসব কথা অসুস্থ মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু জয়নাল জানায় সত্যিই তার জীবনে একবার এমন 'আচানক' ঘটনাটি ঘটেছিল। নদীর পানিতে ডুবতে যাওয়া একটি গরুর বাচ্চাকে বাঁচাতে সে দৌড়ে বাচ্চাটির কাছে উপস্থিত হলো। সে জানায় –

> পানি থাইক্যা বাচ্চাটারে টাইন্যা তুইল্যা দেহি আমি নিজে পানির উপর দাঁড়াইয়া আছি। আমি নদী পার হইছি হাঁইট্যা। আমার পায়ের পাতাটা খালি ভিজছে।[১]

এরপর আর কোনদিন জয়নাল পানিতে নামেনি। তবে তার সাধু হওয়ার সাধ জাগে। আরেকবার পানির উপর দিয়ে হাঁটতে মন চায়।

সেদিন সন্ধ্যায় মারা গেলো জয়নাল। মবিন সাহেব দেখলেন অসংখ্য কাক আর পা ভাঙা কুকুরটি হাসপাতালের বারান্দায় লাইন বেঁধে বসে আছে। প্রকৃতির প্রতি প্রান্তিক মানুষের গভীর ভালোবাসার কারণে প্রকৃতি জয়নালকে করেছে অলৌকিকতার নায়ক। রহস্যঘেরা প্রকৃতির বুকে জয়নালের জীবনে ঘটে যাওয়া অতি প্রাকৃত ঘটনাটি সে মুছে ফেলতে চায়নি আর চায়নি, বলেই পানি থেকে সে দূরে থেকেছে। জীবনে ঘটে যাওয়া একটি রহস্যের উৎস খুঁজতে খুঁজতেই সে পার করে দিয়েছে পার্থিব জীবন।

আব্দুল বাসেত নামের নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের গন্ধ বিষয়ক সমস্যা নিয়ে গল্প 'মৃত্যুগন্ধ'। যে মানুষটি আজ-কালের মধ্যেই মারা যাবে তার শরীরে তিনি এক ধরনের গন্ধ পান যা পরিচিত জগতের কোন গন্ধের সাথে মেলে না। তিনি ডাক্তার দেখাতে এসেছেন। রোগের ধরন শুনে ডাক্তার সাহেব অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় গন্ধ বিষয়ক নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত জানিয়ে বললেন – মৃত্যুগন্ধ বলতে আসলে কোন গন্ধ পৃথিবীতে নেই।

বিজ্ঞানের শিক্ষক আব্দুল বাসেত কী করে অবৈজ্ঞানিক বিষয়ে চিন্তা করেন তা ডাক্তার সাহেব বুঝে পেলেন না। ডাক্তার সাহেব তার সাথে বেশ কিছু রসিকতাও করলেন। আব্দুল বাসেত জানালেন যে, তার স্ত্রী আত্মঘাতী হওয়ার পূর্বে এই রকম গন্ধটি প্রথম পান তিনি। এর পর হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোন রোগীর গায়ে তিনি গন্ধ পেয়েছেন আর সে মারা যায় নি – এমনটি কখনো হয় নি।

১. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫১২

> ডাক্তার সাহেব আরো কিছু রসিকতা করে আব্দুল বাসেতকে পরের দিনের চায়ের দাওয়াত দিয়ে তিনি উঠতে চাইলেন। একটা পার্টিতে না গেলেই নয়। তাকে এখনই উঠতে হবে। বাসেত সাহেব কিছু বললেন না – 'তার মন অসম্ভব খারাপ হয়েছে। কারণ কাল এই লোকটির সঙ্গে দেখা হবে না। লোকটির গা থেকে তীব্র মৃত্যুগন্ধ বের হচ্ছে।'[১]

কিন্তু ডাক্তার সাহেব কি তার কথা বিশ্বাস করবেন ? নাকি আরো বড় ধরনের কোনো রসিকতা করবেন?

সকলের মাঝে থেকেও প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন 'আয়না' গল্পের শওকত সাহেব। পরিবারে তাঁর প্রয়োজন কেবলই অর্থের যোগান দেয়ার জন্য। তাঁর স্ত্রী ও তিন মেয়ে। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। শওকত সাহেব নির্ভেজাল মানুষ। তাঁকে কেউ ঘাটায় না।

তিনিও কারো ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না। অবশ্য আগ্রহ দেখিয়েও কোন লাভ নেই। কেউ তাকে তেমন পাত্তা দেয় না। তাঁর স্ত্রীর ভাষায় 'মুখ- সেলাই করা', 'বটগাছতুল্য' আশ্চর্য এক মানুষ তিনি। প্রায় নিশ্চল এই মানুষটি তাঁর একটি ভাঙা হাত-আয়নায় চিত্রলেখা নামের এক মেয়ের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন। চিত্রলেখা ছোট মেয়ে। তার সাথে গল্প করে কাটে শওকত সাহেবের নিঃসঙ্গতা। একদিন তাঁর স্ত্রী ভাঙা আয়নাটি ফেলে দিয়ে নতুন একটি আয়না কিনে আনলেন। আয়নাটি হারিয়ে শওকত সাহেব পাগলের মতো হয়ে গেলেন –

> রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার ডাস্টবিনে হাতড়াচ্ছেন । তাঁর গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি দু'হাতে ময়লা ঘেটে যাচ্ছেন।[২]

শওকত সাহেব খুঁজে বেড়ান সে ছায়া মানবীকে যে তার নিঃসঙ্গতা দূর করেছিল।

নিয়তিতাড়িত মানুষের অস্বাভাবিক ক্ষমতার গল্প 'পরেশের হইলদা বড়ি'। পরেশ বৈদ্য আজিজ মিয়ার কাপড়ের দোকানে কাজ করে। ভালো মানুষ এবং সৎ মানুষ। পরশ এতো ভালো যে, আজিজ মিয়া তার বড় মেয়ে পরীবানুর সাথে তার বিয়ে পর্যন্ত দিতে চায়। কিন্তু আজিজ মিয়ার স্ত্রী 'কচ্ছপ খাওইন্যা' ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিবে না। পরেশের আছে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা। তাকে কে একজন 'হইলদা বড়ি' দিয়েছিল। তা খাওয়ার পর থেকে সে সামনে-পিছনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা দেখতে পারে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫৮৮

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫৪১

মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ সে জানতে পারে। যেমন, সে সেদিন জেনে গেছে আজিজ মিয়ার বড় মেয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেবে। কিন্তু তার অবশ্য কিছু করার নেই। কারণ –

> হইলদা বড়ি তাকে শিখিয়েছে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটার সব ঘটে আছে। এর কোনো কিছুরই কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। মানুষের কাজ শুধুই দেখে যাওয়া।[১]

'গুণীন' গল্পে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও স্ত্রীর প্রতি প্রবল ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে চান্দ শাহ ফকির তথা সেকান্দর আলীর জীবনগাথায়। অশরীরী আত্মার কাছে নিজের অবস্থার পরিবর্তন না চেয়ে স্ত্রীর রোগমুক্তির প্রার্থনা সেকান্দরকে মহিমান্বিত করেছে। ভণ্ড ফকিরি কারবার থেকে নিজেকে শুদ্ধ জীবনের প্রতি ধাবিত করার প্রতিজ্ঞা করেছে স্ত্রীর চাওয়ার কারণেই। গভীর দাম্পত্য সম্পর্কের সাথে চমৎকার রহস্যময়তার গল্প 'গুণীন'।

'আনোভা' গল্পের ভৌগোলিক পরিসীমা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে। আমেরিকায় গাড়ির ড্রাইভার এক বাঙালির দায়বদ্ধতা, মানবপ্রেম অত্যন্ত রোমহর্ষক কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

হুমায়ূনের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায় –

হুমায়ূন আহমেদের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোয় আছে প্রকৃতির রহস্যময়তা। কার্যকারণহীন এবং ব্যাখ্যাতীত ঘটনা গল্পে ওঠে এসেছে। অবশ্য অতিপ্রাকৃত গল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই কার্যকারণহীনতা এবং ব্যাখ্যাতীত বিষয়। অদ্ভুত রসের এসব গল্পে মানবেতর প্রাণিদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। গল্পগুলোর চরিত্রেরা যারা রহস্যময়তাকে লালন করে তারা সবাই প্রায় প্রান্তিক মানুষ। উন্মীলিত- নিমীলিত এসব মানুষের জীবন জুড়ে আছে অজ্ঞেয়-অমীমাংসীমিত রহস্যের জাল। তবে হুমায়ূন আহমেদের গল্পের জগৎ রহস্যময় হলেও অন্ধকার আর বিকৃত নয়। গল্পের চরিত্রগুলো প্রায়ই নিঃসঙ্গ। এরা বাস করে একা । জনতার মাঝেও এরা থাকে নির্জনতায়। গল্পগুলোর আছে কাঠামোবদ্ধ জীবন থেকে নিজেকে উত্তরণের এবং প্রকৃতিকে জয় করার অদম্য স্পৃহা। প্রকৃতির অতি তুচ্ছ উপাদানের প্রতিও আছে গভীর মমতা ও ভালবাসা। আর আছে মানুষের জয়গান। 'হুমায়ূন আহমেদ মায়াবী গল্পের মানবিক জাদুকর'। অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোতেও মানুষের জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে।

[১] গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৬৬৪

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক গল্প –

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর সায়েন্স ফিকশনগুলোকে বিষয় আর রচনাকৌশলে নিয়ে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। গল্পগুলো শেষ পর্যন্ত মানবিক দলিল হয়ে উঠেছে। সায়েন্স ফিকশন লেখায় হুমায়ূন আহমেদ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে প্রথম সায়েন্স ফিকশন হুমায়ূন আহমেদই লিখেছেন। ১৯৭৩ সালে বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত 'তোমাদের জন্য ভালবাসা' বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রথম সায়েন্স ফিকশন। বর্তমানে বাংলাদেশে সায়েন্স ফিকশনের যে জনপ্রিয়তা সেটি হুমায়ূন আহমেদের একক প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে।

'যন্ত্র' গল্পটি তাঁর প্রথম সায়েন্স ফিকশন। মানুষের অমরত্বের পর্যায়ে যাওয়ার গল্প 'যন্ত্র' । পৃথিবীতে এখন জনসংখ্যা নিবারণ করা হচ্ছে ভয়াবহভাবে। মানুষের কোনো কাজ নেই। সব কাজ করে রোবট। গল্পে দেখা যায়, এক বৃদ্ধ তার সমস্ত টাকা জমিয়ে পি থার্টি টু নামের একটি যন্ত্র কিনে আনেন। পৃথিবীর অসংখ্য দম্পতি আছে যারা তাদের সন্তান জন্মানোর অধিকার পায়নি। তাঁদের যন্ত্রের আনন্দের দরকার আছে। মানব জাতির স্বার্থেই এটি করা হচ্ছে। বৃদ্ধের ক্রয়কৃত যন্ত্রটি বেশ কিছু শ্বাপদ জন্তুর মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। বায়ো কারেন্টের মাধ্যমে এই স্মৃতি মানুষের মাথায় সঞ্চালিত হয়। মানুষ পৈশাচিক আনন্দে মেতে ওঠে।

গল্পের শেষে দেখা যায়, মানুষ অমরত্ব লাভ করেছে। তাদের কোনো কাজ করতে হয় না। কাজ করার জন্য আছে রোবটশ্রেণি। লেখক জানাচ্ছেন –

> অমরত্বের বেশি আর কিছু তো মানুষের চাইবার নেই। এখনকার মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পি থার্টি টু যন্ত্র লাগিয়ে পশুদের জীবনের অংশবিশেষ যাপন করতে তাঁদের বড় ভালো লাগে। এই তাঁদের একমাত্র আনন্দ।[১]

জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভাঙার বেদনা, অনিশ্চয়তা, ব্যাকুলতা, মানবিক বোধ – এসব না থাকলে মানুষের জীবন হবে পশুর মতো। এই শাশ্বত সত্যটিই গল্পটির মূল উপজীব্য।

'অঁহক' গল্পে বিজ্ঞানের বহু তথ্য আর কল্পনার সম্মিলন ঘটেছে। হুমায়ূন আহমেদ বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হওয়ায় তাঁর গল্পে বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও উপাত্ত অনায়াসেই উঠে আসে। তাঁর প্রচুর জানা শোনার বিষয়টি গল্পে ধরা পড়ে। 'অঁহক' গল্পে মানুষ সম্পর্কে এলিয়েনদের ধারণা –

- মানুষ অতি নিম্নশ্রেণির বুদ্ধিহীন প্রাণীর মতো খাদ্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করে।
- খাদ্য সঞ্চয়, সংগ্রহ, পরিপাক ও বর্জনে অনেক সময় চলে যায় বলে তারা শিক্ষা ও চিন্তার সময় পায় না।
- মানুষের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাই নিম্ন সভ্যতা।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪৬৬

গল্পটিতে মানব সভ্যতা বিকাশের দুর্বলতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি উন্নত প্রাণী হিসেবে মানুষের ত্রুটির প্রতিও বিদ্রূপ করা হয়েছে।

‘সে’ গল্পটির মরালিটি চিন্তাকর্ষক। মানুষের গর্ভে জন্ম নেয় অদ্ভুত এক প্রাণী। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একতাল মাংসপিণ্ড। হাতির শুঁড়ের মতো আট দশটি শুঁড় বেরিয়ে এসেছে মাংসপিণ্ড থেকে। শুঁড়গুলি ক্রমাগত ছোট বড় হচ্ছে। মানব শিশুর সাথে এর একটি মাত্র মিল আছে আর তো হলো – এর দুটি বড় বড় চোখ আছে। প্রকৃতি ইভোলিউশন প্রক্রিয়ায় নতুন কোনো প্রাণ সৃষ্টির কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। তবে মানুষ তাতে বাধা দিচ্ছে। মানুষের পৃথিবীতে বীভৎস প্রাণের সৃষ্টি মানুষের মাধ্যমে করতে গেলে প্রকৃতিকে হাই-প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ অস্বাভাবিকতাকে সহজে মেনে নেবে না – এটিই এই কল্পবিজ্ঞানের মূল কথা।

‘জাদুকর’ গল্পটি কিশোর উপযোগী গল্প। বাবলুর অঙ্কভীতি দূর করে দেয় এলিয়েন হইয়েৎসুন। এ গল্পেও মানুষের আবেগ, বাৎসল্যপ্রীতি, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই উঠে এসেছে।

‘কুদ্দুসের একদিন’ গল্পে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে এক অফিসের সাধারণ পিয়ন চলে যায় চতুর্মাত্রিক জগতে। সেখান থেকে সে ফিরে আসে সময়কে স্থির করে। সে ফিরে যায় কৈশোরের ভয়াবহ সেই রাতে, যে রাতে তার বাবাকে সাপে কেটেছিল। কুদ্দুস আনন্দময় কৈশোরে ফিরতে চেয়েছে। তাই এলিয়েনদের কাছ থেকে সময়কে বেঁধে এনেছে।

‘নিউটনের ভুল সূত্র’ গল্পে মানুষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ভেদ করছে। তাতে অবশ্য সাধারণ মানুষ তাকে পাগল হিসেবেই চিহ্নিত করছে। বিজ্ঞানের সকল বিষয় জয় করতে মানুষকে যে অনেক বেগ পেতে হবে – তাই এ গল্পে উঠে এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকরণশৈলী

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকরণশৈলী

হুমায়ূন আহমেদের গল্প-বলার কৌশল ছিল অভিনব। গল্পের মধ্যে পাঠককে ধরে রাখার অত্যাশ্চর্য কৌশল জানা ছিল তাঁর। সর্বশ্রেণির পাঠক তাই তাঁর গল্পের মধ্যে আনন্দরসের সন্ধান পেয়েছেন। বিষয় ও প্রকরণের মিশেলে তাঁর গল্প পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে রসময় ও কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পবিন্যাসের কৌশলে, দৃষ্টিকোণ ব্যবহারে, চরিত্রায়ণে, ভাষাবিন্যাসে কিংবা আলংকারিক পরিচর্যায় তাঁর গল্প বিপুল পাঠকের আগ্রহ ও সমাদর অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

প্রকরণশৈলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ চরিত্রায়ণ কৌশল। হুমায়ূন আহমেদ চরিত্র চিত্রণে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। নারী চরিত্র নির্মাণে তিনি এক ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি যেন হয়ে উঠেছেন তাদের অভিভাবক। ফলে তাদের তিনি কোনো জটিল পরিস্থিতিতে ফেলতে চান না। তারা জগতের সব গ্লানি, কদর্য, কলুষ থেকে দূরে থাকে। হুমায়ূন আহমেদের নারী চরিত্রগুলোর ভেতরকার নানা রকম দোষক্রুটি থাকা সত্ত্বেও অতিদ্রুত তিনি তাদের নির্মল-শুদ্ধ পরিবেশে স্থাপন করেন। তাঁর গল্পের বেশির ভাগ নারী চরিত্রই তাই শেষপর্যন্ত শুভ্র ও পবিত্র। 'রূপা', 'একটি নীল বোতাম', 'ফেরা', 'অসময়', 'শঙ্খমালা', 'সৌরভ', 'ভালোবাসার গল্প', 'পাথর', 'আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ', 'পাখির পালক'-প্রভৃতি গল্পের নায়িকা চরিত্রগুলোর রুচি, সৌন্দর্যবোধ, জীবনাচরণ এ বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

হুমায়ূনের নারী চরিত্রগুলোর পার্থক্য কেবল নামে। তারা সবাই সুন্দর। হৃদয়ে প্রচুর প্রেম তাদের। নায়কের সাথে প্রণয় হয় কিন্তু পরিণয় হয় না। প্রায় গল্পের সমাপ্তিই পরিণতিহীন। প্রেমের জন্য নায়কেরা কোনো নায়িকাকেই দোষারোপ করছে না। বিচ্ছেদ-ব্যর্থতায় নিজেদের দায় কাঁধে নিয়েই নায়িকাদের দায়মুক্তি দিচ্ছে নায়কেরা। যেমন – 'একটি নীল বোতাম', 'একজন ক্রীতদাস', 'পাখির পালক'– এ তিনটি গল্পই পরিণতিহীন প্রেমের গল্প। তিনটি গল্পের নায়িকাই প্রায় একইভাবে কথা বলে, চিন্তা করে, তাদের রুচিবোধও একই মানের। তিনজন নারী সম্পর্কে নায়কদের মনের ভাবনাও প্রায় কাছাকাছি –

> ক. আমি ফিরে যাচ্ছি আমার খুপড়ি ঘরে। অন্যসব রাতের মতো আজ রাতেও হয়তো ঘুম হবে না। ... এই পরিবারটির কাছ থেকে একটা নীল বোতামের বেশি পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। এই সহজ সত্যটি আজ রাতেও আমার মাথায় ঢুকবে না।[১]
>
> খ. সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল, সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।[২]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৫

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৯২

গ. জরীর মতো মেয়েদের কখনো খুঁটিয়ে দেখা যায় না। এদের সঙ্গে দেখা হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন সবসময়ই অস্পষ্ট।[১]

উপরিউক্ত তিনটি গল্পে হুমায়ূন আহমেদ মূলত বলে গেছেন ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে তিনজন বেকার ছেলের সমস্যা ও সম্ভাবনা, স্বপ্নবুনন ও স্বপ্নভাঙার কথকতা। গল্প তিনটির পুরুষ তিনজনকে আলাদা করে চেনা গেলেও মেয়ে তিনটিকে আলাদা করা যায় না। তারা যেন এক ও অভিন্ন সত্তা।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পান্তর্গত চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু বিষয় আরোপ করেন যাতে, ঐ চরিত্রের প্রতি পাঠকের একটা প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়। কখনো দেখা যায় যে, চরিত্রটির উল্লেখ আছে তবে মূল ঘটনার সাথে চরিত্রটি সম্পৃক্ত নয়; তবু চরিত্রটির কথা মনে থাকে। যেমন, 'রূপা', কিংবা 'শঙ্খমালা' গল্পের নারী চরিত্র দুটি মূল ঘটনায় অনুপস্থিত কিন্তু তাদের প্রতি পাঠকের আবেগ ও আগ্রহ প্রবল।

প্রান্তিক নারীর চরিত্র রূপায়ণে হুমায়ূন আহমেদ বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'জীবন-যাপন', 'শীত', 'নন্দিনী', 'সগিরন বুয়া', 'অতিথি', 'পাপ'– প্রভৃতি গল্পে প্রান্তিক বাঙালি নারীর জীবনসংগ্রাম, দাম্পত্য-সম্পর্ক, প্রেম, আশা ও আশাভঙ্গের বহুমাত্রিক সংযোজন নারী চরিত্রগুলোকে মহিমান্বিত করেছে। 'শীত' গল্পের ফুলজান স্বামীহারা হয়েও ব্যক্তিত্বহীন কিংবা চরিত্রহীন হয়নি। যুদ্ধের সংকটে পড়েও 'নন্দিনী' গল্পের নন্দিনী যুদ্ধের বাজারে নিজেকে বিক্রি করে দেয়নি। 'পাপ' গল্পে চিরায়ত বাঙালি নারীর অতিশয় দরদি মনের চিত্রটি পাপ-পুণ্যের সংকটকে ঘনীভূত করেছে। সগিরন বুয়ার জীবন-সংগ্রাম ও বাৎসল্য প্রীতি মুগ্ধতা ছড়ায়। 'অতিথি' গল্পে সংসারের জন্য নারীর ত্যাগ বাঙালি নারীর অনন্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

প্রেমময়ী নারী, প্রান্তিক নারীর পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদ নারীর মাতৃসত্তাকেও নির্মাণ করেছেন চমৎকারভাবে। 'জিন-কফিল' গল্পের মাওলানা এরতাজউদ্দিনের স্ত্রী লতিফা মানসিক চাপে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বারবার হত্যা করে নিজের সন্তানকে। লতিফা চরিত্রটি হুমায়ূন আহমেদের অসাধারণ সৃষ্টি।

'শঙ্খমালা' গল্পে সন্তানের প্রতি মাতৃপ্রেম যথার্থ বাঙালি মায়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। 'অসুখ' গল্পে মাতৃরূপটি আরো হৃদয়স্পর্শী। যুদ্ধে মা তাঁর ছেলেকে হারিয়েছেন, এটি কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো ছেলেটিকে হত্যা করা হয়েছে জবাই করে। সন্তানের মৃত্যু দৃশ্যটি মনে করেই গর্ভধারিণী মা হয়ে পড়েন অপ্রকৃতিস্থ। তখন তাকে শোনাতে হয় সন্তানের স্বাভাবিক মৃত্যুর মিথ্যা গল্প। এরপর কিছুদিন তিনি সুস্থ থাকেন। এ চরিত্রটিও হুমায়ূনের অপূর্ব নির্মাণ।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫; পৃষ্ঠা-১৬৪

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের নারী চরিত্র আছে 'নিশিকাব্য', 'ফেরা', 'সৌরভ', 'অসময়'–প্রভৃতি গল্পে। এই নারীরা সংসারের প্রতি অনুরাগী। কেউ আদর্শ বাঙালি স্ত্রী, কেউ বা আদর্শ কন্যা। 'সৌরভ' গল্পের লিলি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি শিক্ষিত নারীর চমৎকার প্রতিনিধি। 'ইভিনিং ইন প্যারিস' নামের একটি সুগন্ধির জন্য যে প্রায় খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছিল, বাবাকে বারবার বিরক্ত করছিল সে মেয়েটিই গল্পের শেষে এসে যেভাবে বিকশিত হয়েছে তা সত্যিই অসাধারণ। গল্পের শেষে লিলি যখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে–'আমার শিশি লাগবে না। তোমার কী হয়েছে বাবা'? – তখনি পাঠক এক অনন্য অনুভূতিরসে সিক্ত হয়ে ওঠে। মুহূর্তে ভাঙা শিশির অপরূপ সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়-সংসারময়। হৃদয়ের এমন সৌরভ দিয়েই বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত নারীরা বাঁচিয়ে রাখে সংসারকে।

হুমায়ূন আহমেদের 'বাবা চরিত্র'গুলো নিতান্তই ভালো মানুষ ধরনের। সংসার-সমাজ-ধর্মের নানা জটিলতা-কুটিলতা বর্জিত স্রেফ নির্ভেজাল মানুষগুলোই তাঁর গল্পের 'বাবা' হয়ে উঠেছেন। এঁদের আছে অপরিসীম বাৎসল্যপ্রীতি, স্বভাবসুলভ রসবোধ আবার কোথাও বা উদাসীনতা। 'একটি নীল বোতাম' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান বাবা চরিত্রটি হাস্যোজ্জ্বল একজন সুখী মানুষ। কৌতুকপ্রিয় এই মানুষটির আছে সম্মোহনী শক্তি। গল্পের নায়ক রন্জুর দৃষ্টিতে এশার বাবা মানুষটি চমৎকার মনের–'এশার বাবার সঙ্গে কথা বললে আমার মন খারাপ ভাবটা কেটে যায়।'

'জুয়া' গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ প্রণব বাবুর মাঝে দেখি অতিশয় দরদি মন। বাৎসল্যপ্রীতি মানুষটিকে অনন্য মহিমা দান করেছে। দুই লক্ষ টাকার লটারি জিতেও সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়তে পারেননি বলে অনুশোচনায় তিনি জর্জরিত হয়েছেন। সন্তানকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদেছেন। 'আনন্দ-বেদনার কাব্য' গল্পেও দেখা যায় একজন পিতার বাৎসল্য প্রীতি। এক কবি-বাবা তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইয়ের উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন –

> দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে রিক্তশ্রী পৃথিবীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ নূরন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচ্ছদ চিত্রটি অঙ্কন করে। অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায় আমার বেনু মা দেখিতে পাইলো না।[১]

'ফেরা', 'সৌরভ', 'জাদুকর' 'জনক' 'সুলেখার বাবা', 'জীবন-যাপন', 'কবি', 'আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ' গল্পে যেসব বাবা চরিত্র আছে তাদের সবাই সাদামাটা, সন্তানের প্রতি অনুরাগী মানুষ।

'খাদক' গল্পের বাবা চরিত্রটি কিছুটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। খাদক মতি মিয়া বাজিতে জিততে চায় বলেই ক্ষুধার্ত সন্তানদের সামনে রেখে খেয়েই যায়। 'অন্তরার বাবা' গল্পে মৃত্যু চিন্তায় আক্রান্ত এক খামখেয়ালি বাবা চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৭৩

অন্তরার মায়ের ভাবনায় চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ –

> এ রকম মানুষের আসলে সংসার করাই ঠিক না। এরা আসলে মানুষও না। ঘরের আসবাব। সংসারে এদের ভূমিকা ফার্নিচারের মতো। জায়গা মতো ফার্নিচারটা বসিয়ে দাও। মাঝে মধ্যে ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ধুলা উড়িয়ে দাও-সব ঠিক।[১]

নেতিবাচক চরিত্র নির্মাণে হুমায়ূন আহমেদের এক ধরনের দরদ দেখা যায়। নেতিবাচক অনেক চরিত্রকেই তিনি মানবিক গুণে ঋদ্ধ করেন কখনো কখনো। যেমন –'অয়োময়' গল্পের বদরুল আলম সাহেব অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী ইউনুসকে সহ্যই করতে পারেন না। আবার তাকে ফেলে দিতেও পারেন না। প্রায়ই তিনি তাকে গালি দিচ্ছেন। কিন্তু যখন ইউনুস বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তখন তিনি নিজেই তাকে নিয়ে মহিষের গাড়িতে করে রওয়ানা হন হাসপাতালের দিকে। ইউনুসকে অভয় দিয়ে বললেন–'ঝুলে থাক। হাল ছাড়িস না। আমি আছি।' '১৯৭১' গল্পেও দেখি পাকিস্তানি মেজরের প্রশংসা। যদিও মেজরের অমানবিক অনেক দিকই গল্পে বর্ণিত হয়েছে তবু মেজরের রূপের বর্ণনাটি লেখক করেছেন –

> খাকি পোশাক পরা কারো মুখে পাইপ মানায় না। কিন্তু মেজর সাহেব অসম্ভব সুপুরুষ। তাঁর মুখে সবকিছুই মানায়।[২]

'পঙ্গু হামিদ' গল্পের হামিদ, 'আলাউদ্দিনের ফাঁসি' গল্পের আলাউদ্দিন, 'কৃষ্ণপক্ষ' গল্পের হানিফ, 'অপেক্ষা' গল্পের বশির মোল্লা কিংবা 'পাথর' গল্পের চিত্রার মা–এরা খলচরিত্র বটে তবে তারা ঠাণ্ডা মাথায় তাদের কাজগুলো গুছিয়ে সম্পাদন করে। এদের চরিত্রের সবটুকু নেতিবাচক নয়। দু-একটি মানবিক গুণ এদের মধ্যেও আছে বলে তাদের বিধ্বংসী মনে হয় না। পাঠক কোনো চরিত্রের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করতে পারে না। ভালো-মন্দ মিলিয়েই যে মানুষ – হুমায়ূনের খলচরিত্রগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে।

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে মানুষকে লালন করে আসছে আবহমান কাল থেকে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ মানুষের মনের ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে মানব-সন্তানের ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম। সাহিত্যেও প্রকৃতি হয়ে উঠেছে অপরিহার্য অনুষঙ্গ। 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত সাহিত্য রচিত হয়েছে সেগুলোর পরতে পরতে আছে প্রকৃতির ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতি। বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি বহুমাত্রিকতায় ভাস্বর। হুমায়ূন আহমেদের গল্পে প্রকৃতির বর্ণনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। জলজোছনার অপরূপ বর্ণনা তাঁর গল্পকে দান করেছে অসামান্যতা। প্রকৃতি তাঁর রচনাশৈলীতে নবতর রূপে বর্ণিত হয়েছে। 'একটি নীল বোতাম' গল্পে প্রকৃতি কাব্যিক বর্ণনায় উপস্থিত। এ গল্পের নায়ক রাত জেগে থাকে চৈত্র মাসের গরমের কারণে। তবু এ জেগে থাকাটা অর্থহীন নয়, কারণ এ সময়টিতে সে কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠার অবকাশ পায় –

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৬৩৫

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৭

> চৈত্র মাসের গরমে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। নানা রকম কল্পনা মাথায় আসে। কল্পনায় আমার এই ঘর হয়ে যায় পদ্মা নদীর নৌকায় একটা ঘর। জানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়েছে। চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে।[১]

মানুষের মন যেমন প্রকৃতির কারণে প্রভাবিত হয় তেমনি প্রকৃতিও মানুষের মনের অনুরূপ হয়ে ওঠে কখনো কখনো। নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থহীন জীবন যখন বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয় তখন প্রকৃতিও যেন হয়ে ওঠে প্রাণহীন, নিস্পন্দ। 'জুয়া' গল্পের শেষাংশে দেখি স্কুল শিক্ষক প্রণব বাবুর দুঃখের সাথে প্রকৃতি হয়ে গেছে একাকার –

> তাঁর কথাকে সমর্থন করেই যেন ঘরের ভেতর থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। বাইরে মাছের চোখের মতো মরা জোছনা।[২]

'জোছনা রাত' হুমায়ূন আহমেদের গল্পের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। প্রকৃতির এই অনুপম দিকটির প্রতি লেখকের প্রবল আগ্রহের কথা তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়। গল্পেও তিনি জল-জোছনার অপরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন –

> ক. বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেঘ কেটে অপরূপ জ্যোৎস্না উঠেছে। বৃষ্টি ভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জ্যোৎস্না।[৩]
>
> খ. বারান্দায় ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন আমার অন্ধ বাবা। তাঁর পাশে একটি শূন্য টুল। ঘরের সমস্ত কাজ শেষ করে আমার মা এসে বসবেন সেখানে। ফিসফিস করে কিছু কথা হবে। দুজনেই তাকিয়ে থাকবেন বাইরে। একজন দেখবেন উথাল-পাতাল জ্যোৎস্না, অন্যজন অন্ধকার।[৪]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের চরিত্রগুলোর কারো কারো নির্জনতা খুব প্রিয়। প্রকৃতির কল-কোলাহলের চেয়ে নির্জন প্রকৃতির প্রতিই তাদের আগ্রহ। বিশেষ করে রাতের নির্জনতার প্রতি প্রবল আসক্তি তাদের। যেমন –

> ক. এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তবু ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায় একটু হেঁটে হেঁটে বেড়াই। নিশি রাতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার বেশ লাগল। তুমি কি দস্তয়োভস্কির 'রূপালি রাত্রি' পড়েছো? 'রূপালি রাত্রি'তে আমার মতো একজন নিশি পাওয়া লোকের গল্প আছে।[৫]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২২

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৬২

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১২৭

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৭৭

[৫]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৯০

খ. রাস্তাঘাট নির্জন। শহরতলির মানুষরা সব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তারস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে চারপাশে? গাছে গাছে নিশি-পাওয়া পাখিদের ছটফটানি। তবু মনে হচ্ছে চারপাশ কি চুপচাপ।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃক্ষকে 'আদি প্রাণ' বা 'প্রাণের প্রথম জাগরণ' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতি-বৃক্ষের সঙ্গে মানুষেরও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। 'অচিন বৃক্ষ' নামের গল্পটিতে দেখা যায় অসহায় প্রান্তিক মানুষ প্রকৃতির কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছে। স্কুলের দরিদ্র শিক্ষক স্ত্রীকে বড়ো ভালোবাসেন। কিন্তু স্ত্রী তাঁর প্রচণ্ড অসুস্থ। প্রায় দুই লাখ টাকা লাগে চিকিৎসার জন্য। এতো টাকা যোগাড় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই তাঁর ভরসা 'অচিন বৃক্ষ।' এই গাছে একদিন ফুল ফুটবে। সেই ফুল সর্বরোগের মহৌষধ। তাঁর স্ত্রী আরোগ্য লাভ করবে। সর্বসহায়হারা এসব প্রান্তিক মানুষ মূলত প্রকৃতির অলৌকিকতায় বিশ্বাসী। প্রকৃতি হয়তো সব নিরাময় করে দেবে – এই তাদের বিশ্বাস।

আবার 'শিকার' গল্পে দেখা যায় মানুষই প্রকৃতিকে বিনষ্ট করছে। প্রান্তিক মানুষ আজরফ। তার নেশা ও পেশা বক ধরা। আরেক অন্ধ দরিদ্র মানুষ মতি মিয়া। সে একসময় পাখি শিকার করতো। বক ধরতে গিয়ে তার চোখ দুটো নষ্ট হয়েছে। একই গ্রামের সফদর আলীর চোখও গেছে একই কারণে। মতি মিয়া তাই সতর্ক করে আজরফকে –

বক পক্ষী মরণঠোকর দেয় বুঝছস? আর ঠোকর দেয় জায়গামতো। পরথম ধাক্কায় যায় ডাইন চউখ, পরের ধাক্কায় বাঁও। দুনিয়া হয় আন্ধাইর। নয়নের মতো জিনিস নাইরে বাজান।[২]

এ গল্পের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি লেখকের পরম মমতার দিকটি উঠে এসেছে।

গল্প বলার কৌশল শিল্পিত প্রকরণশৈলীর গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পে প্রায়ই উত্তমপুরুষের ব্যবহার করেছেন। তাঁর গল্প বলার মধ্যে একটি কৌশল আছে – সেটি হলো গল্পে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। অনেক সময় তিনিও একটি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। এর ফলে গল্পের প্রতি পাঠকের তৈরি হয়েছে বিশ্বস্ততা। 'রূপা', 'জিন-কফিল', 'রহস্য', 'অচিন বৃক্ষ', 'পিশাচ', জনৈক আব্দুল মজিদ', 'বুড়ি', 'লিপি', 'খাদক' গল্পে এ কৌশলটি তিনি নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। এসব গল্পে অধ্যাপক ও লেখক হুমায়ূন আহমেদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। 'লিপি' গল্পে মূল গল্পের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে –

১৯৮০ সালের জুন-জুলাই মাসের ঘটনা। আমি তখন নর্থডেকোটায়। স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছি। হঠাৎ একদিন মেইল বক্সে একটা চিঠি পেলাম।[৩]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৭৮

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-১১১

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৫৬৯

লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি তথ্য থাকায় পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গল্পটির বাস্তবতা সত্যিই প্রশ্নাতীত। হুমায়ূন আহমেদের শৈলী কুশলতার কারণে অবশ্য শেষপর্যন্ত গল্পগুলোকে অভিজ্ঞতার বর্ণনা, দিনলিপি কিংবা স্মৃতিকথা মনে হয় না। অন্তিম বিচারে এগুলো গল্পই; এবং জীবনঘেঁষা মানুষের গল্প।

কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ নয়, পার্শ্ব চরিত্রের দৃষ্টিকোণও তিনি গল্পে ব্যবহার করেছেন। 'একটি নীল বোতাম', 'একজন ক্রীতদাস', 'শঙ্খমালা', প্রভৃতি গল্পের বর্ণনা এসেছে চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন –

> পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।[১]

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণেও অনেক গল্প বর্ণনা করেছেন তিনি। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে গল্প বর্ণনা করলেও অতিকথন নেই কোথাও। বাকসংযম তাঁর বর্ণনার একটি বড় ৈবশিষ্ট্য। ছোটগল্পে ঘটনার আকস্মিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। হুমায়ূন আহমেদ গল্প বর্ণনার কোনো এক পর্যায়ে কে.শলে এই বাঁকটি নির্মাণ করেন। পাঠক গল্পের শেষ পর্যন্ত না গেলে সেটি ধরতেও পারে না। যেমন 'রূপা' গল্পে দেখা গেল গল্পের নায়ক রূপাদের ড্রাইভারের কাছে বাড়ির ঠিকানা চাইল। ড্রাইভার যে ভুল একটি ঠিকানা দিয়েছিল তা বোঝা গেল গল্পের প্রায় শেষে। এমন চমকপ্রদ আকস্মিকতার কারণে হুমায়ূন আহমেদ অর্জন করেন পাঠকের ভালোবাসা।

গল্পের প্রাণ হলো ভাষা। ভাষা‣শলী দিয়েই গল্পের সার্থকতা নির্ণীত হয়। হুমায়ূন আহমেদ গল্পে ব্যবহার করেছেন সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা। বাংলা সাহিত্যে বনফুল ব্যতীত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় গল্প লিখেছেন খুব কমসংখ্যক লেখক। হুমায়ূন আহমেদের গল্পের কাহিনি যেমন চেনা জগতের, ভাষাও তেমনি চেনামুখ থেকেই নেওয়া। এ বিষয়ে সমালোচকের মতটি প্রণিধানযোগ্য –

> হুমায়ূন তাঁর লেখায় জীবনের মহাকাব্যিক বিস্তৃতি আনেননি, কিন্তু অনন্য কে.শলে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে পাঠকের কাছে জীবনকে টগবগ করে ফুটে উঠবার অবকাশ দিয়েছেন। অথচ কত সহজ তাঁর উপস্থাপনা, ভাষা কত অনাড়ম্বর।[২]

১. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৯২।

২. আজহার ইসলাম, আধুনিক শিল্প ভাবনার ৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি,হাসান হাফিজ সম্পাদিত হুমায়ূন আহমেদ সমকালের চোখে।পৃষ্ঠা- ১৪৮

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের ভাষায় কোনো গাম্ভীর্য নেই। আড়ম্বরও নেই। একটির পর একটি সরল বাক্য সাজিয়ে তিনি আশ্চর্য কে.শলে শব্দের মালা গাঁথেন –

> আমি তার হাত ধরলাম। এই কুড়ি বছর ধরেই ধরে আছি। মাঝে মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করি। ভ্রান্তির এই গল্প আমার স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছা করে। বলতে পারি না।[১]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের ভাষা প্রাণময়। প্রত্যহিক জীবনের কথামালাই তাঁর গল্পে হয়ে উঠেছে দ্যুতিময় । হুমায়ূন আহমেদের গল্পে যেসব আঞ্চলিক সংলাপ রয়েছে সেগুলো ময়মনসিংহ-নেত্রকোণা অঞ্চলের মানুষের। অবশ্য এই অঞ্চলের ভাষায়ও হুমায়ূন কিছুটা কৃত্রিমতা আরোপ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত –

ক. যে বক ধরে তার চউখ থাকে না। চউখ তার যায়। আইজ হউক, কাইল হউক চউখ যায়। আমারে দেইখ্যা বুঝস না?[২]

খ. স্যার, জয়নাল হইল গিয়া আফনের পাগলা কিসিমের মানুষ। শইলের কোনো যত্ন নাই।[৩]

গ. আফনে আমার সামনে থাইক্যা যান। আমার সামনে বইশ্যা আফনের কষ্ট হইতেছে।[৪]

আঞ্চলিক ভাষায় এ পরিবর্তনের ফলে ভাষা বরং হয়ে উঠেছে অনেক বেশি উপভোগ্য, নির্ভার ও শ্রুতিমধুর। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর নাটক-সিনেমাতেও এই ভাষা কিছুটা পরিবর্তিত রূপেই ব্যবহার করেছেন। আর এ কারণে অনেক সময়েই কুশীলবদের সংলাপ শুনেই বলে দেয়া যায় নাট্যকারের নাম। এই স্বাতন্ত্র্যটি তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ মুন্সিয়ানাতেই সম্ভব করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য ছোটগল্পেও তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ল্যাদল্যাদা, ভ্যাবদা, লদকা-লদকি, আচানক, ভয়ঙ্কর সুন্দর, অসম্ভব সুন্দও – প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে হুমায়ূন আহমেদ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ভাষাব্যবহারে পরিমিতিবোধ হুমায়ূনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রতিশব্দ ব্যবহারেও ছিলেন সংযমী। অনেক কথা তিনি অল্পতেই সেরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গল্প '১৯৭১'-এ মাত্র একটি বাক্য দিয়েই একজন নির্যাতিত বাঙালির বিদ্রোহী সত্তাটি স্পষ্ট করেছেন তিনি –

> সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।[৫]

কয়েকটি সরল বাক্য ব্যবহার করেই একজন রূপবতী নারীর বর্ণনা শেষ করেন হুমায়ূন আহমেদ। এক্ষেত্রে পাঠকের কল্পনাকে অবারিত করে দেন তিনি। রূপ বর্ণনার ভাষাও আড়ম্বরহীন –

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৩

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১১১

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫১০

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৫২১

[৫]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪১

ক. কী মিষ্টি চেহারা! দীর্ঘ পল্লব, ছায়াময় চোখ। সেই চোখ সবসময় হাসছে।[১]

খ. নীলু মেয়েটি অসম্ভব রূপবতী।[২]

প্রথম বাক্যটি দিয়ে রূপা নামের একটি মেয়ের রূপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি দিয়ে নীলু নামের একটি মেয়ের রূপের বর্ণনা শেষ করা হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ কোনো চরিত্রের দুঃখ-কষ্ট কিংবা অভাব-অভিযোগ ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন না। অল্প কথায় তা সম্পন্ন করেন। ব্যঞ্জনাময় ভাষায় অল্পতেই বিস্তর বলে যান তিনি –

ক. প্রতিটি ছেলেমেয়ে এমন উদ্ধত হয়েছে। বাবার প্রতি কিছু মাত্র মমতা নেই। নেই বলেই মাসের ছাব্বিশ তারিখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে পারে, না আজই আনতে হবে।[৩]

খ. এখন যদি কেউ আমাকে বলে অমুক লোকের বাড়ির সামনে দিয়ে দশবার ডিগবাজি খেলে আমার একটি চাকরি হবে। আমি সম্ভবত তাও করব। ফজলু করবে তার চেয়ে বেশি। সে হয়তো বিশটা ডিগবাজি খাবে।[৪]

বনফুলের গল্পে যেমন প্রায়ই গল্পের শেষে থাকে একটি ম্যাজিক বাক্য, হুমায়ূনের গল্পেও সেই প্রবণতা লক্ষণীয়। গল্প কখনো হঠাৎ-ই শেষ হয়ে যায় একটি ম্যাজিক বাক্য দিয়ে। যেমন–

ক. আজ রাতেও বোতামটিকে মনে হবে একটি অপরাজিতা ফুল।[৫]

খ. পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।[৬]

গ. আমি অপ্রকৃতিস্থ হতে শুরু করেছি।[৭]

ঘ. এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।[৮]

ঙ. তক্ষকের ডাকের মতো কত রহস্যময় ব্যাপারই না আছে পৃথিবীতে।[৯]

চ. অবাক হয়ে এমন একজনকে দেখছি যে হৃদয়ে ভালোবাসার সমুদ্র ধারণ করে পিশাচ হবার সাধনা করে যাচ্ছে।[১০]

ছ. সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপরূপ সৌরভ উড়িয়ে আনল।[১১]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৭০

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১১৮

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪২৩

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১১৭

[৫]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৫

[৬]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪১

[৭]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১২০

[৮]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১২৬

[৯]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৩৯

[১০]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৬৭৬

[১১]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪২৭

গল্পের ঘটনা বর্ণনায় হুমায়ূন আহমেদ প্রায়ই সংলাপরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। এতে পাঠকের একঘেয়েমি যেমন দূর হয় তেমনি গল্পটিও শিল্পোত্তীর্ণ হয়। যেমন :

ক) – তুমি কী কর?

– আমি এখানকার প্রাইমারী স্কুলের টিচার।

– এখানে আবার স্কুলও আছে নাকি?

– জি স্যার।

– আর কী আছে?

– একটা মসজিদ আছে।

– শুধু মসজিদ? মন্দির নেই? পূজা হয় যেখানে।

– জি না স্যার।

– ঠিক করে বল মন্দির আছে কি না?

– জি না সার।[১]

খ) – নীলু সিনেমা দেখবে নাকি একটা?

– না।

– চল না, যাই।

– নীলু চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

– কথা বল না যে, দেখবে?

– উঁহু। বাড়িতে বকবে।

– কেউ বকবে না। মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা যখন হয় তখন মায়েরা তাদের কিছু বলে না।

– কে বলেছে তোমাকে?

–আমি জানি। তখন মেয়েদের মন খুব খারাপ থাকে। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। এইসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপারে তুমি বুঝবে না। চল সিনেমা দেখি।

– না।[২]

হুমায়ূন আহমেদের গদ্যের আছে নিজস্ব একটি স্টাইল। তিনি প্রাঞ্জল প্রমিত বাংলায় গল্প বলে যান। অনেক সাহিত্যিকই সাধু-চলিতের মিশ্রণ থেকে ভাষাকে বাঁচাতে পারেন না। অনেকের প্রমিত বাংলায় দেখা যায় নদীয়া-শান্তিপুরী ভাষার আবহ। হুমায়ূন আহমেদ এসব থেকে মুক্ত বলা যায়। তাঁর গদ্য ভাষায় কাব্যধর্মী পরিচর্যাও অলক্ষ্য নয়। যেমন –

ক. জরী, আমার কাছে তুমি সুখে ছিলে না? কীসে একটি মানুষ সুখী হয়? নীলগঞ্জে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে তোমার মন কি ভরে উঠেনি? তুমি কি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠনি ? ও মা যেন রাজপ্রসাদ! জ্যোৎস্না রাতে হাত ধরাধরি করে যখন আমরা পুকুর পাড়ে বেড়াতে যেতাম তখন কি গভীর আবেগ তোমাকে এতটুকু আচ্ছন্ন করেনি? তোমাকে আমি কি দেইনি? নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসায় তোমাকে ঘিরে রেখেছিলাম। রাখিনি?[৩]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১২০

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪১৭

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৮৮

খ. পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবনে আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম। আমার জন্য এই দুঃখটার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল।[১]

গ. রাস্তাঘাট নির্জন। শহরতলির মানুষেরা সব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তারস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে চারপাশে। গাছে গাছে নিশি পাওয়া পাখিদের ছটফটানি। তবুও মনে হচ্ছে চারপাশ কি চুপচাপ।[২]

ঘ. – কে, কে?

– আমি, আমি শিখা।

– অগ্নিশিখা নাকি?

– না, আমি প্রদীপ শিখা।[৩]

ঙ. চৈত্র মাসের গরমে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। নানারকম কল্পনা মাথায় আসে। কল্পনায় আমার এই ঘর হয়ে যায় পদ্মানদীর নৌকায় একটা ঘর। জানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়েছে। চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। আমি জানি কে টোকা দিচ্ছে। তবুও কাঁপা গলায় বলি কে?[৪]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের ভাষা গতিময়। এই গতি আছে বলেই বিশেষ করে 'টিনেজার'রা তাঁর গল্পের প্রতি বেশি আসক্ত। গল্পের গতি নির্মিত হয় ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিতেই। তাঁর গদ্যভাষার আশ্চর্য গতিময়তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ –

ক. ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। দূরে ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনে ঘড় ঘড় শব্দ উঠেছে। ট্রেন সত্যি সত্যি এসে গেল।[৫]

খ. সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে – একজন নগ্ন মানুষ।[৬]

গ. আজরফের হৃৎপিণ্ডও লাফাতে লাগল। শরীর ঝন ঝন করছে। স্নায়ু টান টান হয়ে উঠেছে। সময় নেই। আজই সে বোঝাপড়ার দিন। অতি দ্রুত এখন অনুফার হলুদ পা জাপ্টে ধরে ফেলতে হবে। বিদ্যুৎ গতিতে নামিয়ে আনতে হবে নিচে...মাথার উপর উড়তে থাকা বকগুলি দ্রুত নিচে নেমে আসছে। আজরফ হাত বাড়াল। আসছে ওরা নেমে আসছে। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কাঁপিয়ে তারা ডাকল – কক কক।[৭]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৯২

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৭৮

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪০৭

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-২২

[৫]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৩

[৬]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪১

[৭]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১১৬

ঘ. সামসু অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত প্যাডেল চাপতে লাগল। সামনেই ট্রাফিক সিগন্যাল। অনেকক্ষণ সবুজ বাতি জ্বলছে। ওটি লাল হবার আগেই তাকে পার হয়ে যেতে হবে। যাত্রীদের আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দেবার তার সময় নেই।[১]

ঙ. – ইউনুস?

– জে

– ঝুলে থাক। হাল ছাড়িস না, আমি আছি।

ইউনুসের চোখ দিয়ে পানি পড়ে। সে প্রাণপণে ঝুলে থাকতে চেষ্টা করে। মহিষের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যায়।[২]

চ. লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল আনিস। শেষ রাতের ট্রেনটা যেন কিছুতেই মিস না হয়।[৩]

হুমায়ূন আহমেদ আশ্চর্যরকম বাকসংযমী। দুর্দশাগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর ভাষা অত্যন্ত দরদি। দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা প্রায়ই তিনি বিস্তারিত বলেন না। কখনো কৌতুকাবহ সৃষ্টি করে হালকা চালে গভীর বেদনাকে স্যাটায়ারিক করে তোলেন। যেমন 'পাখির পালক' গল্পে অভাবগ্রস্ত একটি পরিবারের নিদারুণ কষ্টের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। পরিবারটির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় বাজার থেকে টাটকা মাছ কেনার সামর্থ্য তাদের হয় না। বাজারে গিয়ে অসংখ্য মাছ টিপে দেখে পচা কিছু মাছ নিয়ে অন্ধকার মুখে বাড়ি ফেরেন দারিদ্র্য পীড়িত মানুষটি। এই যে প্রতিদিনের এমন বীভৎস জীবনযাপনের রূপটি হুমায়ূন আহমেদ বর্ণনা করেন সরস কৌতুকের ভাষায় –

> আজ তিনি দুপুর পর্যন্ত মাছের বাজারে ঘুরবেন। অসংখ্য মাছ টিপে দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু পচা মাছ কিনে বাড়ি ফিরবেন। বাড়িওয়ালার একটি লেবু গাছ আছে। তার পাতাগুলি আমরা পচা মাছ দিয়ে দ্রুত খেয়ে ফেলেছি।[৪]

হুমায়ূনের ভাষায় আছে এক মোহনীয় জাদুকরী ক্ষমতা। ভাষার মধ্যে এমন কিছু বৈপরীত্য তিনি তৈরি করেন পাঠক যাতে মোহগ্রস্ত হয়। পাঠক হয়তো একটি ঘটনা চিন্তা করে একভাবে, হুমায়ূন সেটি আশ্চর্য কৌশলে অন্যভাবে বর্ণনা করেন। এই খেলা তিনি কেবল গল্পান্তর্গত চরিত্র নিয়েই নয়, পাঠকের সাথেও খেলে যান অনায়াসে। আর এক্ষত্রেও তার প্রধানতম মাধ্যম ভাষার জাদুকরী বিন্যাস –

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৯৭

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৫৬

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৩৬

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৫৬

ক. পার্টিতে যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। বুড়ি দশ মিনিট পর পর এসে বলবে, কই এখনো এলে না? সবাই এসে গেছে শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা। আমি যাবার পর দেখি আমিই শুধু এসেছি আর কেউ আসেনি।[১]

খ. সদরঘাটের পুরোনো কাপড়ের দোকান থেকে ছাপ্পান্ন টাকায় কোট কিনলেন একটা। এই কোটটিই তার কাল হয়েছিল। কোটের পকেট থেকে বাকি টাকাগুলো পকেটমার হয়। সব নতুন নোট। তিনি সেদিন অফিসে না গিয়ে রেসকোর্সের মাঠে একটা গাছের নিচে সারাদুপুর বসে ছিলেন। রেসকোর্সের মাঠটাকে গাছ লাগিয়ে যে এত চমৎকার করা হয়েছে তা তিনি জানতেন না।[২]

এই বর্ণনার প্রথমে আছে টাকা হারানোর কষ্টের বিষয়। কিন্তু শেষ বাক্যের বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। এ ধরনের বর্ণনায় চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা প্রকাশ পায়। একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে দ্রুত সরে যাওয়ায় গল্পে এক ধরনের অবকাশ তৈরি হয়। ছোটগল্প এতে গতিশীলতা লাভ করে।

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে হিউমার খুব পরিচিত বিষয়। অনেক সময় সিরিয়াস বিষয় নিয়েও তিনি স্বভাবজাত হিউমার সৃষ্টি করেন। যেমন–

ক. একটু বয়স না হলে বরদের আমার ভালো লাগে না। চেংড়া জামাই আমার কাছে অসহ্য। বিনু এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন চেংড়া জামাই তার আগে কয়েকটি ছিল।[৩]

খ. বেশ কিছু ত্রাণ পার্টি মার খেয়ে ভূত হয়েছে। কাপড়চোপড় খুলে নেংটা করে ছেড়ে দিয়েছে। ...একটা পার্টি খুব সম্ভব শিক্ষক সমিতি - শিশু শিক্ষা বই, খাতা পেনসিল এইসব নিয়ে গিয়েছিল। তাদের এই অবস্থা হয়েছিল।[৪]

গ. টাকাটা পাওয়া গেলে মাস ছয়েকের জন্য নিশ্চিত। শ্যামগঞ্জ বাজারের মেয়ে মানুষটার কাছেও তাহলে ইজ্জত নিয়ে যাওয়া যাবে। মেয়ে মানুষটা বড় তুচ্ছ করছে। গত মাসে একবার গিয়েছিল, দরজা ধরে কঠিন গলায় বলল– আইজ জান গিয়া, ঘরে লোক আছে।[৫]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৭

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪৩১

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৬৫

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৪৫৩

[৫]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৩৪১

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে উপমা, সমাসোক্তি, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। যেমন –

উপমা

ক. বাইরের অস্পষ্ট আলোয় জরীর মুখ অবিকল সেই বালিকা মিনুর মুখের মতো দেখাতে লাগলো।[১]

খ. রুগি পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে।[২]

গ. লাখ লাখ লাল পিঁপড়া লাশের শরীরে। মনে হইতেছে মাগীর সারা শরীরে লাল চাঁদর।[৩]

ঘ. বাইরে মাছের চোখের মতো মরা জ্যোৎস্না।[৪]

ঙ. ফাঁদটাকে তাদের কাছে মনোরম একটা ঝোঁপের মতো লাগে।[৫]

চ. তাকিয়ে দেখি ছোট একটা নীল রঙের বোতাম। যেন একটা নীল অপরাজিতা।[৬]

সমাসোক্তি

ক. হলুদ দড়ি আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল। সেই আলো স্থির নয়। যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নামছে। আলোর ঝরনা।[৭]

খ. সীমাহীন ক্রোধ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।[৮]

গ. দুর্গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে ঘ্যাৎ করে মাথায় চলে যায়।[৯]

উৎপ্রেক্ষা

ক. মাঝে মাঝে সবগুলি পিঁপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাঁদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।[১০]

খ. তঁর কথাকে সমর্থন করেই যেন ঘরের ভেতর থেকে তক্ষক ডেকে উঠল।[১১]

গ. দূর থেকে কেন জানি তাঁকে অচিন বৃক্ষের মতো লাগছে। হাতগুলি যেন অচিন বৃক্ষের শাখা। বাতাস পেয়ে দুলছে।[১২]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৪৪

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৮

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩৪

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৬২

[৫]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১১২

[৬]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৪

[৭]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২১

[৮]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১২০

[৯]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৪৯

[১০].প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৩৪

[১১].প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৬২

[১২].প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৩২৯

চিত্রকল্প

ক. শেষ বিকেলের রোদকে মনে হলো লক্ষ লক্ষ গোলাপ।[১]

খ. সিরাজুদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দুটি মমতায় আর্দ্র।[২]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে বেশ কিছু সংলাপ হয়ে উঠেছে জীবনের এপিগ্রাম। উদাহরণস্বরূপ -

– ইন্টারেস্টিং গল্প বলে যে গল্প শুরু হয় সে গল্প কখনোই ইন্টারেস্টিং হয় না।[৩]

– পুরুষদের রূপের প্রতি মেয়েরা কখনো আকৃষ্ট হয় না। পুরুষদের সব কিছুই তাদের চোখে পড়ে – রূপ চোখে পড়ে না।[৪]

– আমেরিকানরা কাঁদতে পারে না – এই কথা যে বলে সে মহামূর্খ।[৫]

– সুখ কোনো অলীক বস্তু নয় ! এর জন্যে জীবনব্যাপী কোনো সাধনারও প্রয়োজন নেই। প্রভাতের সূর্যকিরণ বা রাতের জ্যোৎস্নার মতোই এত আপনাতেই আসে।[৬]

– এক সাথে দুই - তিনটা কাম করলে কোনোটাই ভালো হয় না।[৭]

– মেয়ে যত সুন্দর তারে নিয়া রটনাও তত বেশি।[৮]

– মায়েরা বড় দুঃখ পুষে রাখে।[৯]

– পাগলরা শিশুদের তাড়া করে ঠিকই - কখনো আক্রমণ করে না।[১০]

– মেয়ে জাতটা হচ্ছে মায়াবতীর জাত।[১১]

– মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা।[১২]

– ঢাকা শহরের মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। একটা গর্ত খুঁড়ে রাখলেও তার চারদিকে ভিড় জমে যায়। কর্মহীন লোকজন গভীর আগ্রহে গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে।[১৩]

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৩২

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৯

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১০

[৫]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৯

[৬]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৮৭

[৭]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১২৩

[৮]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১১২

[৯]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৭৭

[১০]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ২৯৭

[১১]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪৩২

[১২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৯৬

[১৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ১৯৬

– কালো মেয়েগুলি সাধারণত মায়াবতী হয়।[১]

– শরম নারীর ভূষণ, পুরুষের কলঙ্ক। [২]

– মহব্বতের মর্ম পশুপাখিও বুঝে।[৩]

– একজন পুরুষ যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলে তখন তার গলার স্বর এক রকম থাকে, আবার সে যখন কোনো মহিলার সঙ্গে কথা বলে তখন গলার স্বর সামান্য হলেও তরল হয়।[৪]

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে চরিত্রের একই নাম বার বার ঘুরে ফিরে আসে। এই ধারাবাহিকতার কারণে চরিত্রের সাথে পাঠকের একধরনের আত্মীয়তা তৈরি হয়। চরিত্রের দুঃখ-কষ্টে পাঠকের মনও বিগলিত হয়।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পের আঙ্গিক নির্মাণে কোনো ধরনের নিরীক্ষা করেননি। বৈঠকি ঢঙে তিনি গল্প বলে গেছেন। ঘটনার বর্ণনায় আকস্মিকতা আছে। মানব প্রকৃতির অতলস্পর্শী রহস্যময়তাকে তিনি গল্পের কাহিনি বর্ণনার সূত্রে এক করে দিয়েছেন। ফলে তাঁর চরিত্রেরা বাস করে কুহকের জগতে। গল্প বলার প্রচলিত ধারার রীতিকে গ্রহণ করলেও শৈলী নির্মাণে হুমায়ূনের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি জটিল প্রকরণ পরিচর্যার বাইরে গিয়েও জীবনের ছবি এঁকেছেন অনবদ্যভাবে। সরল ভাষায় সাধারণ জীবনের সহজ কথা বলে গেছেন অসাধারণ দ্যুতি ছড়িয়ে।

[১]. গল্পসমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৩৩

[২]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫১৬

[৩]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৬৭৫

[৪]. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫৮১

উপসংহার

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলে হুমায়ূন আহমেদ এক জনপ্রিয় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। প্রায় চল্লিশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে (১৯৭২-২০১২) তিনি বাংলা ও বাঙালির কথা বলে গেছেন পরম মমতায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন বিশ্বস্ততার সাথে। জীবনকে তিনি দেখেছেন বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে তাঁর ছোটগল্পসমূহ বিশ্লেষণ করে তাঁর লেখকমানসের কয়েকটি প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবান্বিত বিজয়গাথা। মুক্তিযুদ্ধকে হুমায়ূন আহমেদ দেখেছিলেন একেবারে কাছে থেকে। তবু তাঁর গল্পে সম্মুখ সমরের বর্ণনার চেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে যুদ্ধোত্তরকালে বাঙালির মনোলোকের ক্ষত। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর গল্পে এসেছে নতুন ভাবনায়, নতুন আঙ্গিকে। যুদ্ধোত্তর হতাশার বিপ্রতীপে তাঁর চরিত্রসমূহ হয়ে উঠেছে ইতিবাচক জীবনেরই পরিপোষক। 'জনক' গল্পের বীরযোদ্ধা কিংবা 'শ্যামল ছায়া' গল্পের তরুণযোদ্ধা বহুকষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছে কিন্তু স্বাধীনতার মন্ত্রবলে তাঁরা বরাবরই ছিলেন উজ্জীবিত।

নারীর জীবন বর্ণনায় হুমায়ূন আহমেদ এক ধরনের মমতা দেখিয়েছেন। জীবনের কদর্য দিকগলো তাঁর অঙ্কিত নারী চরিত্রকে স্পর্শ করেনি। এটি নারীর প্রতি হুমায়ূন আহমেদের নির্লিপ্ততা নয় বরং এক ধরনের সহানুভূতি, শ্রদ্ধা।

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে তাঁর প্রচুর জানাশোনার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। পাঠক গল্পপাঠের আনন্দের সাথে শিক্ষণীয় কিছু অর্জন করে সহজেই। তাঁর প্রায় সব গল্পেই খাবারের আয়োজন থাকে। বৈঠকি ঢঙে তিনি গল্প বলে যান। হুমায়ূন আহমেদের গল্পের ভাষা আড়ম্বরহীন, প্রকরণ জটিলতাবর্জিত। সরল বাক্যের ব্যবহারই তিনি করেন বেশি। প্রকৃতির জল-জোছনার প্রতি তাঁর এক ধরনের মোহ আছে। নিঃসঙ্গ মানুষের চরিত্র অঙ্কনে তিনি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

তাঁর প্রতিপ্রাকৃত গল্পের জগৎ অন্ধকার ও বিকৃত নয়। হুমায়ূন আহমেদ মানবতার শিল্পী। তাঁর সব গল্পেই মানবিকতা স্পষ্ট। মায়াবী গল্পের মানবিক জাদুকর তিনি।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা যায় সহজেই। তিনি লিখেছেন প্রচুর। তাঁর সব লেখা শিল্পমানের বিচারে উত্তীর্ণ হবে না হয়তো। একসময় প্রচুর লিখে তিনি বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনা করেছেন একথাও সত্য। তবে ছোটগল্পে তিনি একেবারেই ঐপথে হাঁটেননি। গভীর মনোযোগে তিনি সৃষ্টি করেছেন একগুচ্ছ মানবিক গল্প।

'হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে থাকবেন তাঁর ছোটগল্পের জন্য' – সৈয়দ শামসুল হকের এই বক্তব্য অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। মানবজীবনের হীরণ্ময় দিকগুলো রূপায়ণের দক্ষতা বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে তাঁকে অমরত্বের অভিধায় ভূষিত করবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি (কালক্রম অনুসারে)

নিশিকাব্য	: জ্ঞানকোষ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪
আনন্দ বেদনার কাব্য	: স্টুডেন্ট ওয়েজ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫
শীত ও অন্যান্য গল্প	: জ্ঞানকোষ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮
অয়োময়	: অনুপম, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০
ভয়	: আফসার ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১
আমার আপন আঁধার	: প্রতীক, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩
জলকন্যা	: সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬
নির্বাচিত গল্প হুমায়ূন আহমেদ	: অন্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০০
ছায়াসঙ্গী	: অন্বেষা, প্রথম প্রকাশ: ২০০৯
আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ	: অন্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: ২০০৯
গল্পসমগ্র হুমায়ূন আহমেদ	: কাকলী প্রকাশনী, পুনঃসংযোজিত ত্রয়োদশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫

সহায়ক গ্রন্থাবলি (বর্ণক্রম অনসারে)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা; বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৫

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯১

আজহার ইসলাম : বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয় ভাবনা স্বরুপ ও শিল্পমূল্য, বা/এ ১৯৯৬

আনিসুজ্জামান, ড. (সম্পাদিত) : হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১২

আনোয়ার পাশা : রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, আনোয়ার পাশা রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড,বা/এ ১৯৮৩

কবীর চৌধুরী : সাহিত্য-কোষ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৪

ক্ষুদিরাম দাস, ড. : বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৪

গিয়াস শামীম : বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০২

গিয়াস শামীম : বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা ২০১৬

চঞ্চল কুমার বোস : বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৯

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন : বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৭

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮৭

বিশ্বজিত সাহা : হুমায়ূন আহমেদের শেষ দিনগুলো, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১৩

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলাদেশের সাহিত্যে, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: মে ২০০২

মফিজ ইমাম মিলন (সম্পাদিত) : হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ, তাম্রলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১৩

মাহবুবুল আলম : বাংলাদেশের সাহিত্য, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯

রফিকউল্লাহ খান : বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, বা/এ ঢাকা, ১৯৯৭

শাকুর মজিদ : হুমায়ূন আহমেদ: যে ছিল এক মুগ্ধকর, প্রথমা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১৩

সাইদ-উর-রহমান (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৩

সালাউদ্দিন আইয়ুব : আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৪

সালাহউদ্দিন, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) : জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ, মুক্তপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১২

সৈয়দ আকরম হোসেন : প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭

সৈয়দ আজিজুল হক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৯৮

সৌমিত্র শেখর, ড. : কথাশিল্প অন্বেষণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬

হাসান হাফিজ (সম্পাদিত) : হুমায়ূন আহমেদ সমকালের চোখে, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

হুমায়ূন আহমেদ : বসন্ত বিলাপ, প্রথমা সংকলন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১২